ইনকিলাব

নিমাই ভট্টাচার্য

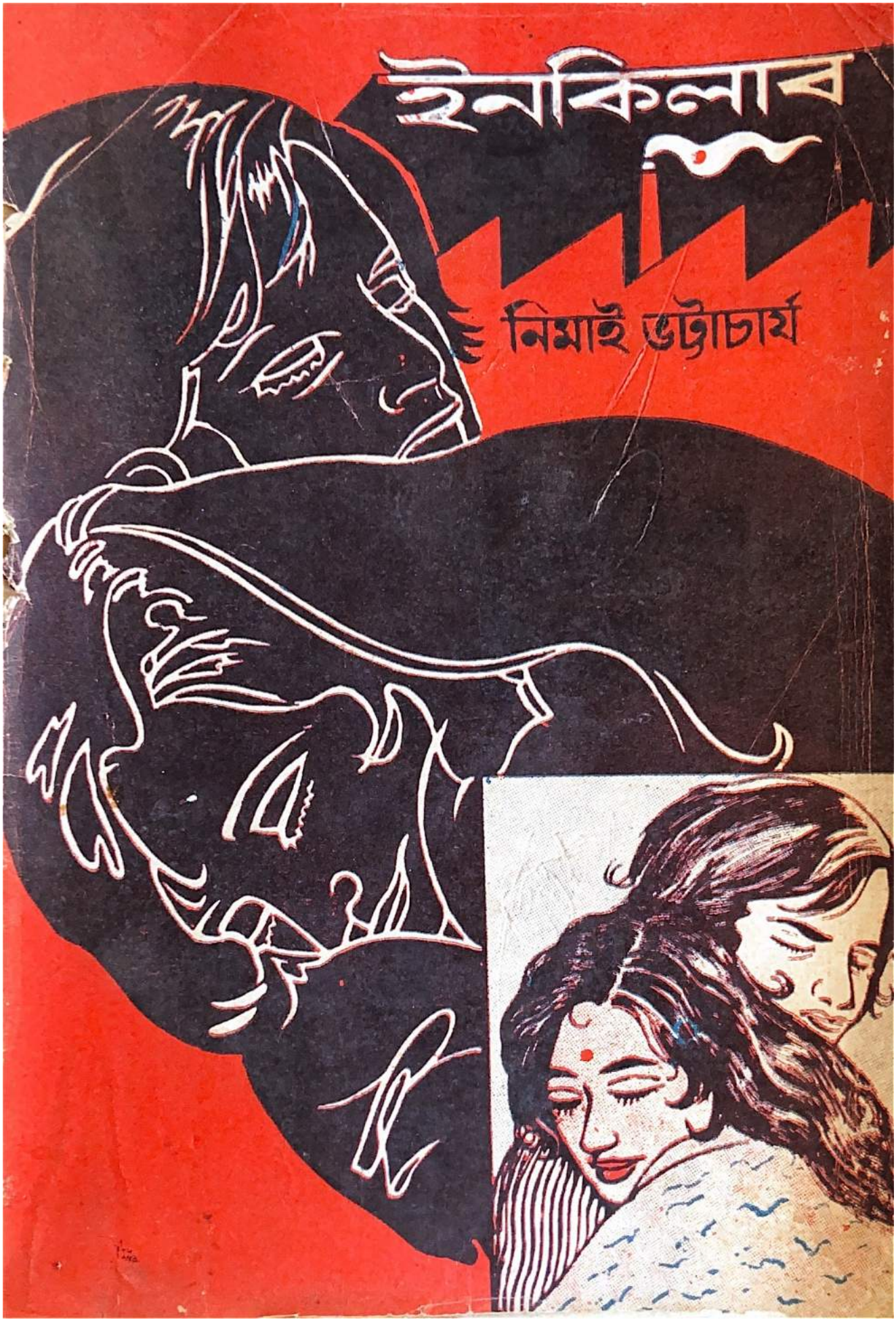

B-135

ইনকিলাব

নিমাই ভট্টাচার্য

ছবি প্রকাশনী
মীরপুর, ঢাকা।

প্রকাশিকা :—
লায়লা বেগম।

মূল্য —আট টাকা মাত্র (সাদা)
ছয় টাকা মাত্র (নিউজ)

মুদ্রাকর :
নারায়ন মেশিন প্রেস,
নবাবপুর রোড,
ঢাকা।

উৎসর্গ ঃ—

সারা দুনিয়ার মেহনতী
জনতার করকমলে।

নিমাই ভট্টাচার্য

SHARIF BUILDERS.
66/B, Swamibag
Dacca-2

INKILUB

A BENGALI NOVEL

BY

NIMAI BHATTACHARYYA

PRICE : Tk. 8·00 (White)
Tk. 6 00 (News)

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লেখা থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। তারপর ভি-আই-পি, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট, ককটেল, ম্যাডাম, তোমাকে, ডিফেন্স কলোনী, উইং কমাণ্ডার, আকাশ ভরা সূর্য তারা লিখে সে যোগাযোগ আরো গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এবং এজন্য আপনাদের সবার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের বই বেরিয়েছে। হয়তো আরো বেরোবে, সেজন্য আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার বই কেনার আগে অনুগ্রহ করে আমার লেখা বইয়ের তালিকা দেখে নেবেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য

'ইনকিলাব"—আমার লেখক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবেই আমার নিকট বিবেচ্য, জানিনা আপনাদের নিকট ভাল লাগবে কি না ? তবু যদি এই উপন্যাসটি পড়ে আপনারা কিছুটা আনন্দ পান তা হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

নিমাই ভট্টাচার্য

মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণ শেষ হতেই অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর তরুণ ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয় কেজরিওয়াল মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলেন, যাঁর অনুপ্রেরণায় ও আন্তরিক সহযোগিতায় এই সিমেন্ট কারখানা আজ চালু হচ্ছে, আমাদের সেই পরম শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবার প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে অনুরোধ করছি।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হাততালি পড়ল। অভিনন্দিত হ। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘোষণা।

মুখ্যমন্ত্রী গভর্ণরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চেয়ার ছেড়ে মাইক্রোফোনের সামনে আসতেই দুম-দুম-দুম! লাটসাহেব, মুখ্যমন্ত্রী থেকে সমবেত কয়েক হাজার মানুষ ভয়ে আতকে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সুপারও তাঁর কয়েক শ' অনুচরেরা হতবাক। বিস্ময় কাটবার আগেই প্যাণ্ডেলের এক পাশ থেকে একজন শ্রমিক চিৎকার করে উঠলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী।

জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!
জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!
জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

একটু আগে ঘাবড়ে গেলেও নিজের জয়ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী ভীষণ খুশী। সারা মুখখানা খুশীর হাসিতে ভরে গেল। ভাবাবেগে মনের কথা চেপে রাখতে পারলেন না, সত্যি কথা বলছি বোমার আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এসব কলকাতার

ষ্টাইলে অভ্যর্থনা পেতে আমরা ঠিক অভ্যস্ত না হলেও বলতে দ্বিধা নেই ভালই লাগল। এভাবে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মী বন্ধুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে হাততালি।

মুখ্যমন্ত্রী একটু থেমে আবার শুরু করলেন, খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই কয়েকটি প্রদেশে গত কয়েক বছর ধরে এমন বিচ্ছিরি রাজনৈতিক অশান্তি চলেছে, যে বহু শিল্প-পতিই একটু শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য আমাদের রাজ্যে এসেছেন। আমরা চাই না কোথাও কোন অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি হোক; কারণ তাতে সারা দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়। যাই হোক আমাদের রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠলেও তা সারা দেশের মানুষেরই জন্য…

হাততালি।

বন্ধুগণ, আধুনিক জীবনে সিমেন্টের এক বিশেষ ভূমিকা আছে ঘরবাড়ী স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, ব্রীজ—সব কিছুতেই সিমেন্ট চাই। আমি আশা করব এই কারখানার শ্রমিক ও কর্মীদের প্রচেষ্টায় এই কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের-দশের কল্যাণ হবে। আর একটি কথা বলতে চাই যে এই অঞ্চলটি বড়ই অনগ্রসর। বলতে লজ্জা হলেও একথা সত্য যে এখানকার মানুষ এখনও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ধকারে পড়ে আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কোন আশীর্বাদই এরা উপভোগ করার সুযোগ পায় নি। এই বিরাট ও আধুনিক সিমেন্ট কারখানার জন্য এই অঞ্চলের অসংখ্য হতভাগ্য মানুষের জীবনেও আমূল পরিবর্তন আসবে। ইতিমধ্যেই অনেক কিছু হয়েছে এবং আরো হবে।

গণ্ডগ্রামের মানুষের জীবনে এই বিবর্তনই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লব—ইনকিলাব। তাই তো বলি এই বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। বলুন, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ!

ইনকিলাব!

জিন্দাবাদ!

ইনকিলাব!

জিন্দাবাদ!

ইনকিলাব!

জিন্দাবাদ!

মুখ্যমন্ত্রী নিজের আসনে ফিরে যেতেই স্বদেশ বর্মন কোথা থেকে ছিটকে এসে মাইক্রোফোনের সামনে দাড়িয়ে চিৎকার করল, মুখ্যমন্ত্রী!

শত শত কণ্ঠ গর্জে উঠল, যুগ যুগ জীও! যুগ যুগ জীও!

মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছেলেটিকে কী কলকাতা থেকে এনেছ?

হ্যাঁ।

খুব ওস্তাদ আছে তে।

হ্যাঁ ছেলেটি খুব ভাল! ইন ফ্যাক্ট আমি যাদেরই কলকতা থেকে এনেছি তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল।

আরো তোমাকে কী বলব বিজয়। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে কম ইণ্ডাস্ট্রী তো চালু করলাম না! প্রত্যেকেই আমাকে বলেছেন কলকাতার একজন ওয়ার্কার যা কাজ করে, এখানকার তিনজনে তা পারে না।

দ্যাটস রাইট। আমি যদি কলকাতা থেকে লোকজন না আনতাম তাহলে এই ফ্যাক্টরী চালু হতে আরো এক-দেড় বছর

দেরী হতো।

তাই নাকি ?

তাছাড়া প্রোডাকশন এত হোত নাকি ? কলকাতার একজন মিস্ত্রী যে কাজ হাসতে হাসতে করবে, তা করতে এখানকার অনেক এঞ্জিনিয়ারও সাহস পাবেন না।

আরে বিজয়, এসব কিছু কিছু বিশেষ কারণ না হলে কী ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এমনি এমনি এত রকমের ইণ্ডাস্ট্রী এত বছর ধরে চলতে পারে ?

ওদিকে স্থানীয় এম-এল-এর ভাষণ চলছে। এদিকে মুখ্য-মন্ত্রী আর বিজয় কেজরিওয়ালের কথাবার্তা চলছে। বিজয়বাবু বললেন, আমাদের জয়ন্তী ক্যানের ফ্যাক্টরীতে সাত মাস ধরে স্টাইক চলার পর পাঁচ মাসের প্রডাকশনে আমাদের সমস্ত লস কভার করার পর এক কোটি আঠাশ লাখ টাকা লাভ হয়েছে। বোম্বে বা মাদ্রাজের কোন কারখানায় এ হতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাইরে আমরা যাই বলি না কেন, কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার আনন্দই আলাদা !

কলকাতার যেসব লোকজনকে এখানে এনেছ তাঁরা এখানে থাকবেন তো ?

বিজয়বাবু একটু হেসে বললেন, একটু বেশী মাইনে আর কিছু এ্যডিশন্যাল সুযোগ-সুবিধে দিয়ে এনেছি। তাছড়া এরা প্রত্যেকেই আমাদের কাছে বহুকাল ধরে কাজ করেছেন। এদের সবার সঙ্গেই আমাদের একটা অন্য ধরনের সম্পর্ক

মুখ্যমন্ত্রী ওর মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে বললেন, ওয়ার্কার-দের সঙ্গে যদি ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে পার তাহলে কারখানা চালাতে অসুবিধা হবে না।

আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে এই শঙ্করগড়ের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা না করতাম তাহলে হয়ত এখানে ফ্যাক্টরী করাই মুস্কিল হতো।

ঠিক বলেছ।

আমি এই গ্রামের প্রত্যেকটা লোককে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

খুব ভাল করেছ।

বক্তৃতা পর্ব শেষ হতেই গভর্ণর একটা সুইচ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীর চারিদিকে সাইরেন বেজে উঠল। অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর যাত্রা শুরু হল।

এরপর বিজয়বাবু গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীকে জীপে চড়িয়ে সারা ফ্যাকটরী দেখিয়ে শ্রমিক ও কর্মীদের কলোনীর সামনে পৌঁছতেই...

গভর্ণর সাহেব !

জিন্দাবাদ !

গভর্ণর সাহেব !

জিন্দাবাদ !

গভর্ণর সাহেব !

জিন্দাবাদ !

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী !

যুগ যুগ জীও !

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী

যুগ যুগ জীও।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী

যুগ যুগ জীও !

মুখ্যমন্ত্রী সোনালী ফিতা কেটে কলোনীর উদ্বোধন করতেই বিজয়বাবু মথুরা প্রসাদকে কাছে ডাকলেন। মথুরা হাতজোড়

করে মাথা নীচু করে মাননীয় অতিথিদের নমস্কার জানাতেই বিজয়বাবু গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, মথুরাপ্রসাদ এই শঙ্করগড়েরই বাসিন্দা। অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর প্রথম কর্মী। ও আপনাদের কলোনী ঘুরিয়ে দেখাবে।

মথুরা প্রসাদের এই সম্মানের কারণ আছে। ভারতবর্ষের মানচিত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলেও শঙ্করগড়কে দেখা যাবে না। মানচিত্র স্থান পাবার মত কোন যোগ্যতা বা পুঁজিই শঙ্করগড়ের নেই। কোর্ট-কাছারি তো দুরের কথা একটা ছোট্ট রেল ষ্টেশন বা ডাকঘর পর্যন্ত এখানে নেই। কোর্ট-কাছারির সঙ্গে এখানকার মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার মানুষ জমির মালিক বা প্রজা—কিছুই নয়। লড়াই-ঝগড়া বা মারা-মারি-কাটাকাটি হলেও এরা থানা-পুলিশ কোর্ট-কাছারিতে যায় না। শঙ্করনাথের বটতলায় বসে নিজেরাই নিজেদের বিচার করে। ডাকঘরেরও দরকার নেই এদের। কে এদের চিঠি লিখবে? এরাই বা কাকে চিঠি পাঠাবে? শঙ্করগড়ের গৌরবের মধ্যে গ্রাণ্ট ট্রাঙ্ক রোড আর ছোট সরু একটা খাল। গঙ্গার এক ক্ষীণ ধারাকে মাত্র তিরিশ-চল্লিশ মাইল টেনে এনেই খালের বীরত্ব শেষ। তবে কোর্ট-প্যাণ্ট পরা একদল সাহেব জীপে চড়ে মাঝে মাঝেই খালের ধারে ঘুরতে আসেন। মথুরা প্রসাদ শুনেছে এই খাল বড় হবে, নৌকা চলবে।

কোন কারণে বাইরের কোন সাহেব বা বাবু এ গণ্ডগ্রামের দিকে এলেই মথুরাকে এগিয়ে যেতে হয়। কোট-প্যাণ্ট পরা সাহেব বা বাবুদের সামনে দাড়াবার সাহস বা ক্ষমতা এ গ্রামের আর কারুর নেই। হাজার হোক মথুরা পাঁচিশ-তিরিশ বছর রেল

কোম্পানীতে চাকরি করেছে। রেল কোম্পানী ওকে বছর বছর নীল রঙের উর্দি দিত, থাকবার জন্য রেল লাইনের ধারেই পাকা ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। মথুরা গেট বন্ধ করে দিলে দু-দিকের রাস্তায় উপর সারি সারি বাস-লরী ছাড়াও কত বড় বড় সাহেব-দের মোটরগাড়ী পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকত। মোটরগাড়ীর সাহেবরা বারবার অনুরোধ করলেও ও গেট খুলতো না। মথুরা সবুজ পাখা নাড়লেই রেলগাড়ী হুস করে বেরিয়ে যেত কিন্তু লাল পাখা দেখালেই থামতে হতো। কতবার ও লাল পাখা দেখিয়ে দিল্লী-কলকাতার রেলগাড়ী পর্যন্ত থামিয়ে দিয়েছে। পান্না তখন ছোট। ওদের বাড়ীর সামনে বিরাট রেলগাড়ীটা থেমে গেলে ওর কি আনন্দ হোত! আনন্দে হৈ-চৈ শুরু করে দিত।

সেসব দিনগুলো মথুরার ভালই কেটেছে। পান্নার মা গান গাইতে গাইতে মেয়েকে ঘুম পড়াতে গেলেই মথুরা পাগরী খুলে হাসতে হাসতে কাছে বসত। কখনো মেয়েকে আদর করত, কখনো স্ত্রীর সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা। কিন্তু মথুরার কপালে সুখ সইল না পান্না যখন পাঁচ বছরের তখন শীতলা মার কৃপায় তার মা মারা গেল। অনেকে অনেকবার বললেও মথুরা আর বিয়ে করল না। বললো, না, না, বিয়ে আর করব না। সবার কপালে সব সুখ সহ্য হয় না। তাছাড়া সৌতেলী মা এসে যদি পান্নাকে না দেখতে পারে, তাহলে···

একবার ভেবেছিল রেল কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে শঙ্করগড় ফিরে যাবে কিন্তু ওর সাহেব বারণ করলেন, চাকরি ছেড়ো না মথুরা। এখানে কাজকর্মের ভিতর দিয়ে দিনটা ঠিকই কেটে যাবে। তাছাড়া সবচাইতে বড় কথা সব সময় মেয়েকে চোখের সামনে রাখতে পারবে।

যারা ঢোল বাজিয়ে সন্ধ্যার পর গান গাইতে আসত, তারাও বললো, সাহেব ঠিকই বলেছেন। গাঁওতে গিয়ে ক্ষেতে কাজ করতে হলে পান্নাকে কে দেখবে ?

মথুরা চাকরি ছাড়ল না।

মথুরা ছোট্ট পান্নাকে কাঁধের উপর নিয়ে সবুজ পাখা দেখালেই ড্রাইভার-ফায়ারম্যান ছাড়াও গার্ড-সাহেব পর্যন্ত হাত না নেড়ে পারতেন না। কখনও কখনও কোন কোন ড্রাইভার-ফায়ারম্যান বা গার্ডসাহেব পান্নার জন্য এক প্যাকেট বিস্কুট ছুঁড়ে দিতেন। তারপর পান্না যখন একটু বড় হলো, তখন মথুরার হাত থেকে সবুজ পাখা কেড়ে নিয়ে নিজেই নাড়তো। পান্নাকে সবুজ পাখা নাড়তে দেখলে পার্সেল একসপ্রেসের ড্রাইভার-সাহেব ভীষণ খুশী হতেন। গাড়ী না থামলেও স্পীড কমবেই। ড্রাইভার হরিশ্চন্দ্র চিৎকার করতেন, পান্না বেটি আমার সঙ্গে ইঞ্জিন চালাবি না ?

পান্না জবাব দেবার আগেই গাড়ী বেশ খানিকটা এগিয়ে যেত। পান্না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসত।

হরিশ্চন্দ্র ড্রাইভারের পার্সেল একসপ্রেসের মত দিনগুলোও আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। পান্না বড় হলো। গয়ার এক ফায়ারম্যান মনোহরলালের সঙ্গে বিয়ে হলো। তারপর পান্না আরো বড় হবার পর একদিন গহনা পরে রাজরাণী সেজে মনোহরলালের সঙ্গে সংসার করতে গেল।

মথুরা ইচ্ছা করলেও ছুটি নিয়ে মেয়ের কাছে যাবার বিশেষ সুযোগ পেত না। ড্রাইভার-ফায়ারম্যানদের কাছ থেকেই মেয়ের খবর পেত। খবর পেত পান্না ভাল আছে। বেশ কয়েক মাস পরে খবর এলো পান্না বড় মাষ্টারসাহেবের বাংলায় কাজ করছে। মথুরা শুনে কিছু বললো না কিন্তু মনে মনে একটু অবাক হল।

মনোহরলালের বাবা নেই, মা নেই। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে বহুকাল আগে। মনোহরলাল রেল কোম্পানী থেকে ভাল মাইনে পায়। তার উপর মোটা ওভার-টাইম। মাত্র দুটি প্রাণীর সংসার। এখনও তো ছেলেমেয়ে হয় নি। তাহলে পান্নার ষ্টেশন মাষ্টারের বাংলোয় কাজ করার কি এমন প্রয়োজন হলো? মথুরা অনেক ভেবেও কোন কারণ খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত একবার মেয়েকে দেখার জন্য গয়া চলে গেল।

পান্না হাসতে হাসতে বললো, কিছু চিন্তার নেই বাবুজি। তোমার দামাদের ডিউটির কোন ঠিকঠিকানা নেই। আমি একলা একলা কীভাবে থাকি বল তো?

তা তো ঠীকই।

তাছাড়া আমাদের আশেপাশের লোকগুলো তত সুবিধের নয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বাবুজি।

তা হঠাৎ বড় মাষ্টারজীর বাংলোয়

পান্না আবার হাসে। বলে, বড় মাষ্টারজীর মেয়ে কমাস আগে এখানে এসেছিল। ওর ছোট্ট ছেলেটা আমাদের সামনের মাঠে দৌড়াদৌড়ি করত। আস্তে আস্তে ঐ বাচ্চাটার সঙ্গে আমার খুব প্যার হয়ে গেল।...

তারপর?

আমি মাঝে মাঝেই বড় মাষ্টারজীর বাংলোয় যেতাম। ওর বিবি আমাকে খুব ভালবাসেন। তাই উনি যখন বললেন, পান্না একলা একলা বাড়ীতে বসে না থেকে আমার এখানেই থাকিস। পান্না একবার মথুরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি আর আপত্তি করলাম না।

মথুরা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, ভালই করেছিস। পান্না আর কিছুই বললো না, জানাল না। মথুরা ঐটুকু জেনেই ফিরে গেল।

বছরে এক-আধবার যাতায়াত থাকলেও মথুরা কিচ্ছু বুঝতে পারে নি। পান্না কিছু জানায় নি। মথুরা দুঃখ পাবে বলে পান্না নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করে নি। কটা বছর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে একলা একলা যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পান্না হেরে গেল। হরিশ্চন্দ্র ড্রাইভারের পার্শেল একসপ্রেস চেপে একদিন পান্না কাঁদতে কাঁদতে মথুরার কাছে ফিরে এলো।

জাপানী পুতুলের মত মথুরা লাল-সবুজ পাখা নেড়েছে, আলো দেখিয়েছে, গেট বন্ধ করেছে, খুলে দিয়েছে কিন্তু দুটি দিন কথা বলতে পারে নি কারুর সঙ্গে। শোকে দুঃখে হত-বাক হয়ে গিয়েছিল। অনেক ড্রাইভার-ফায়ার-ম্যানই একটু-আধটু মদ খায়। মদ না খেলে বুঝি ঐ আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিউটি দেওয়া যায় না কিন্তু তাই বলে বাড়ীতে বসে মাতলামী-বদমাইসী? কি বললি পান্না, ঐ হত-চ্ছাড়াটার আরো একটা বউ আছে? তোকে ঘরে থাকতে -ও দিত না? মার-ধর করতো? তোর বাচ্চা হয় নি বলে তাড়িয়ে দিল? বাচ্চা হয় নি, বেশ হয়েছে। ঐরকম মাতাল -বদমাইস বাপের ছেলে না হওয়াই ভাল। কেইটের বাচ্চা তো কেউটেই হবে। দুদিন পরে সে হারামজাদাও তোকে ছোবল মারতো। কাদিস না বেটি, কাদিস না। আমিই তো তোর বুড়ো ছেলে। তোর আর ছেলের দরকার নেই।

দেখতে দেখতে আরো কটা বছর কেটে গেল। মথুরা রিটায়ার করল। বাবা-বেটি চলে এলো শঙ্করগড়। হাজার

হোক গণ্ডগ্রাম। প্রথমে অনেকেই অনেক কিছু বলাবলি করেছিল কিন্তু পান্না নিজেকে এমন গুটিয়ে রাখত যে আস্তে আস্তে সমস্ত গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল। মথুরা ক্ষেত-খামারে একটু -আধটু কাজ করতো। রেল কোম্পানীর পেন্সন তো ছিলই। বাপ-বেটির সংসার বেশ চলে যেত। পান্না আস্তে আস্তে ছবির মত সংসারটাকে গুছিয়ে তুললো। একদিন যারা ওর সমালোচনা করত, যারা আশঙ্কা করত স্বামী পরিত্যক্তা সোমত্ত মেয়ের জন্য অনেক সুখের সংসারেই অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে, তারাও সংসারের কাজ সেরে পান্নার কাছে এসে রেল-গাড়ীর গল্প, গয়ার বড় সাহেবের বাড়ীর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনত।

মথুরার কাছে তো সারা গ্রামের মানুষ ছাড়াও আশে-পাশের বহু পরিচিত মানুষই আসত নানা বিষয়ে পরামর্শ নিতে। আসবে না কেন? এতকাল ধরে যে রেল কোম্পানীর চাকরী করেছে, যে ইচ্ছে করলেই রেল গাড়ী থামাতে পারত, যাকে রেল কোম্পানী পাকা বাড়ী দিয়েছিল তার কাছে তো পরা-মর্শ নিতে আসবেই। এক কথায় গ্রামের সব ব্যাপারেই মথুরাকে সব চাইতে আগে এগিয়ে আসতে হতো।

এই সিমেন্ট কোম্পানীর সাহেবেরা যেদিন প্রথম শঙ্করগড় এলেন সেদিনও গ্রামের সবাই মথুরা প্রসাদকে এগিয়ে দিয়েছিল।

হাত জোড় করে নমস্কার করে বিজয় কেজরিওয়াল বলে-ছিলেন, নমস্তে বড় চাচা, আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

কলকাত্তা তো বহুত বড় শহর। সেখান থেকে এই গরীব দের এখানে এলেন কেন সাহেব?

বড় চাচা, আমার খুবই ইচ্ছে এই গ্রামকেও আমি শহর বানাব, পাকা মোকান বানাব, বিজলী বাতি আনব, ফ্যাকটরী বানাব!.....

মথুরা প্রসাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত গ্রাম থাকতে এই গ্রাম কেন পছন্দ হলো আপনার ?

এখানকার কর্তা-ব্যক্তিরা আমার পিতাজীর বহুকালের দোস্ত। ও'রা বলছিলেন এই অঞ্চলে সিমেন্ট তৈরীর কারখানা হবার অনেক সুবিধা আছে। তাই ··

কিন্তু কারখানা হলে আমরা কোথায় যাব সাহেব ? আমরা ক্ষেত-খামারের···

কিচ্ছু চিন্তা করো না বড় চাচা। শুধু তোমাদের এই শঙ্করগড়ের মানুষকে না আশেপাশের গ্রামের সবাইকেও আমার কারখানায় নোকরি দেব, পাকা মোকানে থাকতে দেব বিনা পয়সায় ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলবে।

সাহেবদের মোটরগাড়ী চারিপাশে মেয়েপুরুষ-বাচ্চা-কাচ্চার ভীড় জমে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে মেয়েপুরুষের দল মথুরার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ গ্রামের সমস্ত মানুষকে স্তম্ভিত করে পান্না জিজ্ঞাসা করল, সাহেব আমি একটা কথা জানতে পারি ?

বিজয় বাবুও একটু অবাক হলেন। একটু মুচকি হেসে বললেন, বল কি জানতে চাও ?

এ গ্রামের মেয়েরাও ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, রোজগার করে। ক্ষেত-খামারের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে এইসব মেয়েরা কী করবে ?

বিজয় বাবু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিও কী ক্ষেত-খামারের কাজ কর ?

আমি ক্ষেত-খামারের কাজ জানি না।

তুমি কি কাজ জান ?

আমি বড় সাহেবদের বাংলো বাড়ীর সব কাজ জানি।

তাই নাকি ?

এবার পান্না কিছু বলার আগেই মথুরা প্রসাদ গর্বের হাসি হাসতে হাসতে বললো, গয়ার বড় মাষ্টার সাহেবের কোঠীতে ও অনেক কাল কাজ করেছে। ও সব রকমের খানা বানান থেকে শুরু করে বড় বড় কোঠীর সব কাজ...

বিজয়বাবু ঐটুকু শুনেই বললেন, তাহলে তো ও আমার বাড়ীতেই কাজ করতে পারবে।

মথুরা চমকে ওঠে, কলকাত্তায় !

না, না। এখানে যে বাড়ী বানাব, সেখানে ..

জরুর, জরুর।

পান্না জিজ্ঞাসা করল, গ্রামের অন্য মেয়েরা ..

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমার ফ্যাকটরী হলে অনেক গ্রামের মেয়েপুরুষরাই কাজ পাবে।

শঙ্করগড়ের মানুষ প্রথমে বিশ্বাস করে নি। সন্দেহ করেছিল হয়ত কলকাত্তার এই সাহেব জমি কিনে ওদের সবাইকে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু মাসখানেক পরেই বিজয় কেজরিওয়াল যখন আবার মোটরগাড়ী চড়ে লোকজন সঙ্গে নিয়ে এলেন তখন সন্দেহ করার কোন অবকাশই রইল না।

বড় চাচা, ইনি হচ্ছেন সেনগুপ্ত সাহেব। কলকাত্তার খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার।

মথুরা প্রসাদ হাত জোড় করে নমস্কার করল, নমস্তে সাব !

নমস্কার !

বড় চাচা, সামনের মাসের দশ তারিখ থেকেই রাস্তা-ঘাট ঘরবাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হবে। লোকজনের অভাবে যেন

সেনগুপ্ত সাহেবের কোন অসুবিধা না হয়।

আরে সাব, দরকার হলে দশ গাঁও এর লোক টেনে আনব।

সত্যি দশ গ্রামের লোক টেনে এনেছিল মথুরা প্রসাদ। মেয়ে-পুরুষ সবাইকে! গণ্ডগ্রাম শঙ্করগড় এক বছরের মধ্যে ঝক ঝকে সুন্দর ছোট্ট একটা শহর হয়ে গেল। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী ইলেকট্রিসিটি, টেলিগ্রাফ অফিস। এমন কী এই ছোট্ট নতুন শহরের অফিসে-বাড়ীতে টেলিফোন পর্যন্ত এসে গেল। প্রথম দিন যখন টেলিফোন চালু হলো সেদিন শঙ্করগড়ের সবাই মেতে উঠল। মেসিন কথা বলে? ঠিক মানুষের মত কথা শোনে, জবাব দেয়? পান্না গম্ভীর হয়ে বললো আমার বড় সাহেবের কোঠীতেও এই টেলিফুন মেসিন ছিল। ঘেন্টি বাজলেই আমি কথা বলতাম।

কৌশল্যা বললো, তোর ডর লাগত না?

ডর কেন লাগবে?

মাগার ··

এদিকে এক কোণায় কেজরিওয়াল সাহেবের কোঠী তৈরী হচ্ছে ওদিকে এগিয়ে চলেছে ফ্যাকটরীর কাজকর্ম। দিনে রাত্রে। হাজার হাজার বিজলী বাতির সামনে সারা রাত ধরে কাজ হচ্ছে। কলকাতা থেকে বিজয়বাবু আবার এলেন কাজকর্ম দেখতে। রাত্রে সেনগুপ্ত সাহেবের আস্তানায় খেতে বসে বিজয়বাবু চমকে উঠলেন, এখানে এসব খাবারের ব্যবস্থা করলেন কী করে?

কেন! পান্নাই তো আছে।

পান্না!

হ্যা। মথুরার মেয়ে।

তাই নাকি? মথুরার মেয়ে এত ভাল রান্না করেত পারে?

মিঃ সেনগুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন, আমিও আগে বিশ্বাস করি নি। আমি কলকাতা ফিরে গেলে আপনি বরং একে আপনার বাংলোতেই রেখে দেবেন।

এরকম একজন লোকই তো আপনার দরকার। কলকাতার বাড়ীর লোক আনলে তো মাছ-মাংস টাচ করবে না।

পান্না দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনেছে। এবার সেনগুপ্ত ডাক দিতেই সামনে এলো জি সাব।

তোর রান্না বড় সাহেবের খুব ভাল লেগেছে। আমি তো কদিন পরেই চলে যাব। তখন তুই বড় সাহেবের কুঠীতে কাজ করতে পারবি ?

পান্না মুখ নীচু করে মাথা নাড়ল।

অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর যাত্রা শুরু হলো। বিরাট লম্বা চিমনিটা জীবন্ত হয়ে আকাশের কোলে ধোয়া ছাড়তে লাগল। ঘরে ঘরে ধোয়া জ্বলে উঠল আলো। প্রাণচঞ্চল হলো সমগ্র এলাকা। আস্তে আস্তে রাত গভীর হয়। শঙ্করগড়ের ক্লান্ত মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত কর্মীর দল। জেগে আছে ফ্যাকটরীর কর্মীরা। ওদের কাছে দিন-রাত্রের প্রভেদ নেই। আর জেগে আছে মথুরা প্রসাদ। দেহটা যত লম্বা চওড়াই হোক মথুরা এখন বৃদ্ধ। রেল কোম্পানী থেকে রিটায়ার করার পরও বেশ কটা বছর পার হয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে আর কত দিনই বা ওর মেয়াদ! হঠাৎ পিছন ফিরে না তাকিয়ে পারল না।

কত কি ভাবছিল মথুরা। নিজের কথা পান্নার মথা শঙ্কর-গড়ের কথা বিজয়বাবুর কথা, সেনগুপ্ত সাহেবের কথা, লাট-সাহেবের-মুখ্যমন্ত্রীর কথা। আরো কত কি। ছোট্ট গ্রাম শঙ্করগড়। পঁচিশ-তিরিশ ঘর বাসিন্দা। ঐ পাহাড়ের মত

উচু মাটির ঢিপিতে এককালে বুঝি ভগবান শঙ্করের মন্দির ছিল। এখনও শিব-রাতির দিন চার পাশে গ্রামের মেয়েরা পূজা করতে আসে। ছোট্ট একটা মেলা বসে। বছরের ঐ একটা দিনই বাইরের কিছু লোকজন এ গ্রামে আসত আর এখন ?

রেল কোম্পানীর মত এই সিমেণ্ট্ কোম্পানীতেও কত জায়গার কত লোক! বাপরে বাপ! কেউ কী কখন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে সারা হিন্দুস্তানের বড় বড় শহরের সাহেবরাও একদিন শঙ্করগড়ে এসে থাকবে ? কেউ কী কোনদিন ভাবতে পেরেছিল লাটসায়েব এখানে আসবেন ? মুখ্যমন্ত্রী আসবেন ?

না কেউ ভাবে নি। কল্পনা করেনি আরো অনেক কিছু। এতকাল রেল কোম্পানীতে চাকরী করেও মথুরা ভাবতে পারে নি সে লাটসাহেব-মুখ্য-মন্ত্রীর পাশে দাঁড়াবে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে আর ফটোগ্রাফাদের ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় সে প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠবে। না, কোনদিন কোন কারণে এ সৌভাগ্য ও আশা করেনি। শঙ্করগড়ের কোন মানুষই এসব সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখি নি। মথুরা মনে মনে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, শঙ্করগড়ে ইনকিলাব এসেছে। তাইতো সে মনে মনে বলে, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ!

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মথুরা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে পান্নার মাকে। মথুরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছে। আর যেন দেহটাকে টানতে পারছে না। পান্নার মা বলছে, আর তোমাকে খাটতে হবে না। এবার এসো, একটু বিশ্রাম নাও। মথুরা বলে, তুমি বললেই কী বিশ্রাম নিতে পারি ? আমি বিশ্রাম নিলে পান্নাকে কে দেখবে।

পান্নার মা হাসে।

হাসছ কেন ?

হাসব না ? পান্নার কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না তুমি চলে এসো ; বিশ্রাম কর।

মথুরা চিৎকার করে ওঠে, তুমি বললেই আমি পান্নাকে ছেড়ে চলে যাব ?

পান্না তাড়াতাড়ি ছুটে যায় মথুরার কাছে, কি হয়েছে বাবুজি ? তুমি ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠল কেন ?

চিৎকার করেছিলাম নাকি ?

তবে কী ?

মথুরা আর কোন কথা বলে না। পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু পান্নার চোখে আর ঘুম আসে না। জানলা দিয়ে দুরের বড় কোঠীর দিকে চেয়ে থাকে আর নিজের জীবনের স্মৃতি রোমথন করে।

কারখানার সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটা আস্তে আস্তে কালো হতে শুরু করল। রোজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই খাটিয়ায় বসে বসেই মথুরা আপন মনে ঐ চিমনিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। উদাস হয়ে যায়। কি যেন ভাবে। ভাবতে ভাবতে মুখের চেহারা বদলে যায়। একটু করুণ বিষণ্ণতার আভা লাগে চোখের কোনায়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। জিজ্ঞাসা করলেও বলে না। বলে, নারে বেটি কিচ্ছু ভাবছি না।

পান্না তর্ক করে না। সকলবেলায় কথাবার্তা বলার ওর সময় থাকে না। তবে মনে মনে স্পষ্ট বুঝতে পারে জানতে পারে।

সংসারের কাজকর্ম সেরে বড় কোঠী যাবার সময়ও পান্না

রোজ ওকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে। একটু অবাক হয় কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, বাবুজি যাচ্ছি।

অধিকাংশ দিনই মথুরা শুধু বলে আচ্ছা বেটি।

নটার সাইরেন বেজে গেছে। পান্না আর দাঁড়ায় না। মাথার ঘোমটা টানতে টানতে চলে যায়।

কোন কোনদিন মনমেজাজ ভাল থাকলে মথুরা ছুটো-একটা পরামর্শ দেয়, বেটি, খুব সাবধানে কাজ করিস। দেখিস কোন জিনিসপত্তর যেন এদিক-ওদিক না হয়।

পন্না একটু হাসতে হাসতে বলে, জিনিসপত্তর এদিক-ওদিক হবে কেন।

ওরে বেটি, কথায় বলে, সিন্দুক খোলা থাকলে সাধুর মনও চঞ্চল হয়। হাজার হোক কোটিপতির বাড়ী!

বুড়ো বাবার কথায় ও একটু অসন্তুষ্ট হয়। অসন্তোষ প্রকাশ না করে বলে, তোমার ভয় নেই বাবুজি; আমার দ্বারা বড় সাহেবের কোন ক্ষতি হবে না।

মথুরা একগাল হাসি হেসে বলে তা জানি বলেই তো তোকে ওখানে কাজ করতে দিয়েছি। মেয়েকে একটু কাছে টেনে সস্নেহে মাথায় হাত দিতে দিতে বলে হাজার হোক কোটিপতির কোঠী। কত লাখ লাখ টাকা খর্চা করে বানিয়েছেন সামান কিনেছেন। সবই তো তোর উপর বিশ্বাস করে...

জানি।

কারখানা চালু হবার পর পান্না যখন বিজয়বাবুর কোঠীতে কাজ শুরু করল, তখন ওদে শুধু রান্না করতে হতো। বাকি সবকিছু করত ঘনশ্যাম। কলকাতা থেকে বিজয়বাবুর সঙ্গে এনে ছিল। ঘনশ্যাম ঘরদোর পরিষ্কার করত বিছানাপত্তর ঠিক করত টেলিফোন ধরত সাহেবকে খেতে দিত। দারোয়ান, রাত্রে

চৌকিদার বড় গেট পাহারা দিত। পাহারা দেওয়া ছাড়া এক কথায় বড় কোঠীর সব কিছুই ঘনশ্যাম দেখত। দরকার হলে অফিসে টেলিফোন করে বলত ঘোষবাবু, নমস্কার! আমি ঘনশ্যাম বলছি।

বল ঘনশ্যাম কী ব্যপার।

এক নম্বর কথা হচ্ছে বর্মনবাবুকে একটু বলবেন বড় সাহেবের শোবার ঘরের এয়ার কণ্ডিশনার বড় আওয়াজ করছে। বর্মনবাবু ব্যস্ত থাকলে অন্য কাউকে যেন পাঠিয়ে দেন।

বর্মনবাবু পাওয়ার হাউস থেকে ফিরে এলেই বলব।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাজারে যাব। একটা গাড়ী চাই।

কখন ?

যখন সুবিধে হয়। বড় সাহেব তো কাল আসছে। তাই বিকেলের মধ্যে বাজার করলেই হবে।

তাহলে তিনটের পর দেওকীনন্দনকে পাঠিয়ে দেব।

দেওকীনন্দনের নাম শুনেই ঘনশ্যাম হাসে।

ঘোষবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো ঘনশ্যাম, হাসছ কেন ?

আরে ঘোষবাবু, দেওকীনন্দনের গাড়ীতে মাছ-মাংস নিলেই বড় বক-বক করে। চিকেন নিলে ত কথাই নেই। খালি বলবে, ছি ছি! বড় সাহেব এইসব খান ··

তাই নাকি ?

হ্যাঁ ঘোষবাবু। আমি ওকে হাজারবার বলেও বিশ্বাস করতে পারলাম না কলকাতার অনেকেই বাড়ীর বাহিরে সব কিছুই খায়।

নামে বড় কোঠী হলেও বাড়ীটি বড় নয়। নীচের তলায় শুধু একটা হল। সোফা আর কার্পেট দিয়ে সুন্দর করে সাজান।

হলের এক পাশ দিয়ে উপরে যাবার সিঁড়ি। উপরে এক পাশে ড্রইং রুম অন্যদিকে পাশাপাশি দুখানা শোবার ঘর। সামনে কোন বারান্দা নেই কিন্তু পিছন দিকে বিরাট বারান্দা সেখানে বেতের সোফা সেট। বারান্দার এক কোণার দিকে কিচেন আর ষ্টোর। ষ্টোরের ওপাশে সারভেন্টস কোয়াটার। ঘনশ্যাম ওখানেই থাকে। বড় সাহেব সুইচ টিপলেই ওর ঘরে একটা বড় লাল আলো জ্বলে। সঙ্গে একটু মিষ্টি বাজনা।

ঘনশ্যাম রোজ দু-বেলা ঘরদোর পরিষ্কার করে। প্রত্যেকটা সুইচ টিপে দেখে আলো জ্বলছে কিনা, গিজার আর এয়ারকণ্ডিশনার ঠিক আছে নাকি। কোন কিছু গণ্ডগোল হলেই হ্যালো ঘোষবাবু!

বিজয়বাবু থাকলে ঘনশ্যাম পান্নাকে বলে, দুটো টোষ্ট দুটো ফ্রায়েড এগ আর কফি হবে ব্রেকফাষ্টের জন্য। পান্না খাবার-দাবার তৈরী করলেও ঘনশ্যাম সাহেবকে খেতে দেয়। দুপুর বেলায় দু-চারজনের জন্য বেশী রান্না হয়। ঘনশ্যাম জানে বড় সাহেব কখন কাকে খেতে বলেন তার ঠিক নেই। রাত্রে বড় সাহেব অফিসে কাজ করেন সাড়ে সাতটা-আটটা পর্যন্ত। তাই তখন আর কেউ ওর সঙ্গে আসেন না। রাত্রে বড় সাহেব কোঠীতে আসার একটু পরেই পান্না বাড়ী চলে যায়।

প্রথম প্রথম এইভাবেই চলত। আস্তে আস্তে ঘনশ্যাম পান্নাকে অন্যান্য কাজ কর্ম শেখাতে শুরু করল। এই মেসিনে পানি গরম হয়। একে বলে গিজার। এই সুইচটাটিপলেই মেসিনে একটা লাল আলো জ্বলছে?

হ্যাঁ।

ঐ লাল আলো জ্বলছে মানেই বুঝতে হবে পানি গরম হওয়া শুরু করেছে। বড় সাহেব আসার এক-দুই ঘন্টা আগেই

এই মেসিন চালাতে হয়। স্নান করার জন্য গরম জল তৈরী না থাকলে বড় সাহেব ভীষণ রেগে যান।

তাই নাকি ?

তবে কী ? ঘনশ্যাম আরো বলে যায়, পানি গরম হবার পর এই ব থ-টাবে গরম আর ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে তৈরী করে রাখতে হবে।

ঘনশ্যাম কোন ত্রুটি রাখে না। বাথটাবে গরম-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে দেখিয়ে দেয়। এবার কোথায় কোন সাবান, কোন তোয়ালে, কোথায় শেভিং সেট, দাঁত মাজার পেষ্ট-ব্রাশ ওডি-কোলন, সেন্ট, চিরুনি, ব্রাশ ইত্যাদি ইত্যাদি কিভাবে রাখতে হবে তুলতে হবে-সব কিছু দেখায়।

এই মেসিনে কামরা ঠাণ্ডা হয়।

জানি।

এই মেসিনও বড় সাহেব আসার দু ঘণ্টা আগে চালু করতে হয়। না হলে কামরা ঠাণ্ডা হবে না। কামরা ঠাণ্ডা না হলে বড় সাহেবের নীদ আসবে না।

তাহলে পাঙ্খা চালু রাখার কী দরকার ?

আস্তে আস্তে পাঙ্খা ঘুরলে কামরার সব জায়গা ভাল ঠাণ্ডা হয়।

বড় কোঠি আর বড় সাহেবকে দেখা শুনার সবকিছু বুঝাবার পর বুড়ো ঘনশ্যাম একটু মুচকি হেসে বললো, আর যা কিছু দরকার হবে তা বড় সাহেবই বুঝিয়ে দেবেন।

তার মানে ?

মানে বড় সাহেব যদি অন্য কিছু খেতে-টেতে চান, তাহলে উনিই বলে দেবেন কিভাবে কি করতে হবে।

এরপর ঘনশ্যাম একদিন বড় সাহেবের সঙ্গেই কলকাতা চলে গেল। যাবার সময় পান্নাকে শুধু বললো, বত্রিশ সাল কলকাতায় কাটাবার পর এখানে কী আমি থাকতে পারি ?

ঘনশ্যামের পরিবর্তে কলকাতা থেকে আর কেউ এলো না। বড় কোঠির ভার নিল পান্না।

বড় সাহেব না থাকলে সকালে গিয়ে বিকালে ফিরে আসে। বড় সাহেব থাকলে যেতে হয় ভোর বেলায় আর বাড়ী ফিরতে ও রাত হয়। বড় সাহেব সাধারণত দু একদিন থেকেই চলে যান। কখনো কখনো তার বেশী। তবে মাসে দুবার আসবেনই। জরুরী। কাজ থাকলে আসা যাওয়া বেড়ে যায়।

বিজয়বাবুর বয়স বেশী নয়। তিরিশ বত্রিশ হবে। তার বেশী কিছুতেই নয়। যেমন রূপ তেমন স্বাস্থ্য। অমানুষিক পরিশ্রম করেন। কলকাতার কথা পান্না জানে না কিন্তু শঙ্করগড়ে এলে উনি যা পরিশ্রম করেন, তা দেখে অবাক হয়। ছটায় ঘুম থেকে উঠে সাতটার মধ্যেই স্নান সেরে পান্নাকে ডাক দেন।

জী সাব !

নাস্তা লাগাও।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই ব্রেক-ফাষ্ট তৈরী করে পান্না বড় সাহেবের ড্রইংরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে বড়ে সাব নাস্তা এখানেই আনব নাকি বারান্দায়.....

এখানেই দাও।

ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতেই দু-তিনবার টেলিফোন আসে কলকাতা থেকে। লাল টেলিফোনে কথা শেষ হতে না হতেই বিজয়বাবু কালা টেলিফোন ডায়াল ঘুরান, নমস্কার বৌদি মিঃ রায় আছেন ?

একটু ধরুন এক্ষুনি দিচ্ছি।

বিজয়বাবু টেলিফোন ধরে থাকেন। শুনতে পান, শুনছ খোকনবাবু তোমাকে ডাকছেন।

মিঃ রায় অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। এখানে আসার আগে বিজয়বাবুদের পেপার মিলের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন ষোল বছর। তার আগে বজবজের ফ্যাকটরীতে ছিলেন ছ বছর। ওদের মত পুরানো কর্মচারীরা বিজয়বাবুকে খোকনবাবু বলেই চেনেন, জানেন।

গুড মর্নিং বি কে!

মর্নিং।

কলকাতা থেকে ফোন এসেছিল?

হ্যাঁ কিন্তু ওরা জয়পুর থেকে এখনও কোন খবর পায় নি।

জিপসামের যা ষ্টক পজিশন তাতে তো আর দেরী হলে কারখানা চালানই মুস্কিল হবে।

তাই বলছি আপনি বরং কাউকে এক্ষুনি জয়পুর পাঠিয়ে দিন। দরকার হলে কিছু খরচ করেও অর্ডারটা হাতে হাতেই আনতে হবে।

ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি গোস্বামীকে বলছি?

আর একটা কথা।

বলুন।

কাল রাত্রে রেডিওতে শুনলাম মোগল সরাই ইয়ার্ডে বটলনেক হয়েছে। আমাদের ওয়াগনগুলো যদি মোগলসরাইতে আটকে যায় তাহলে পি-আর-ওকে এক্ষুনি একটা খবর দিন ভাল করে বিজ্ঞাপন দিতে।

মিঃ রায় শুরু করলেন, আচ্ছা।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে এসে মিঃ রায় টেলিফোনে খবর পেলেন ওদের সিমেন্ট বোঝাই প্রায় একশ ওয়াগন মোগলসরাই ইয়ার্ডে আটকে পড়েছে। বাড়ী থেকেই কলকাতা অফিসের পাবলিক রিলেসান্স অফিসারকে খবর দিলেন, এক্ষুনি বিজ্ঞাপন দিন।

মিসেস রায় শুনে অবাক কিগো তোমাদের সিমেন্ট পাওয়া যাবে না তবু বিজ্ঞাপন দিতে বললে ?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ মানে ?

তুমি এসব বুঝবে না।

কিন্তু সিমেন্ট দিতে পারবে না জেনেও বিজ্ঞাপন দিতে বললে কেন ?' ঐ বিজ্ঞাপন দেখে তো আরো বেশী করে সিমেন্ট চাইবে ?

বেশী লোক সিমেন্ট চাইবে বলেই তো বিজ্ঞাপন দিতে বললাম।

কিন্তু কেন ?

স্ত্রীর প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয়েই মিঃ রায় বলেই ফেললেন ওরে বাবা এইসব মওকায়ই তো কোম্পানী বেশ কিছু কামিয়ে নেয়। বস্তা পিছু যদি পাঁচ টাকা করেও কোম্পানীর ঘরে বেশী আসে তাহলেও কয়েক দিনেই বিশ-পচিশ লাক্ষ এসে যাবে।

হা ভগবান! বেশী দামে মাল বিক্রি করবে বলে এত বিজ্ঞাপন দিতে বললে ?

তোমাকে এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না।

পান্না বিজয়বাবুর এসব ব্যবসা বুদ্ধির খবর রাখে না। সে শুধু দেখে বড় সাহেব সকাল থেকে রাত্রির পর্যন্ত পরিশ্রম

করেন, বড় সাহেব সব সময় চিন্তিত। এক মিনিটের ফুরসত নেই বড় সাহেবের ।

ঘনশ্যামদাদার কাছে পান্না বড় সাহেবের বাড়ীর গল্প শুনেছে বিজয়বাবুর বাবা মা ছাড়া নব্বই বছরের ঠাকুমা এখনও জীবিত কাকারা অন্য বাড়ীতে থাকলেও বিজয়বাবুরা পাচ ভাই বাবা-মা ঠাকুমা কাছেই থাকেন। বিরাট তিনতলা বাড়ী। শুধু বাড়ীর জন্যই এক ডজন মোটরগাড়ী আছে।

পান্না চমকে ওঠে এক ডজন।

ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে বলে কলকাত্তার বাড়ীতে এক ডজন গাড়ীতেও অসুবিধা হয়।

কেন ?

প্রত্যেক সাহেব আর বিবিজীর আলাদা মোটরগাড়ী। ওদেরই এক ডজন গাড়ী লাগে। তাইতো বাড়ীর কাজের জন্য গাড়ী চাইতে হয়।

শুনেই পান্নার চোখ ছানাবড়া হয়।

ঘনশ্যাম গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে সাহেবের বাড়ীতে কত নোকর নোকরানী আর ড্রাইভার আছে জান ?

কত ?

বাইশ জন ?

বিশ, একুশ, বাইশ ?

হ্যাঁ হ্যাঁ বাইশ।

একটু চুপ করে থেকে পান্না জিজ্ঞাসা করে বড় সাহেবদের অনেক টাকা আছে, তাই না ?

ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে বলে সাহেবের এগারটা কারখানা আছে। তার মধ্যে এই সিসেন্ট কারখানা সব-চাইতে ছোট।

পান্না একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে পারে না। একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা বড় সাহেব কখনও বিবি বাচ্চাকে নিয়ে আসেন না কেন ?

বুড়ী মা পছন্দ করেন না।

কেন ?

বাড়ীর সবাই যখন কোথাও যান তখন বিবিজীরাও যান। এই কারখানা যেদিন চালু হলো সেদিন সবার আসার কথা ছিল কিন্তু বুড়ী মার শরীর খারাপ হবার জন্য আসা হলো না।

বড়ো সাহেবের ক'টা বাচ্চা ?

একটা লেড়কা।

লেড়কা কত বড় ?

পাঁচ-ছ সালের হবে।

কথায় কথায় ঘনশ্যাম বলে, এই সাহেবকে নাগপুরের কয়লার খনি বোমবাইতে কাপড়ের কলও দেখতে হয়। মাসে সাত-আট দিনের বেশী কলকাতাতে থাকতেই পারেন না।

বড় সাহেব একলা একলাই ঘুরে বেড়ান ?

হ্যাঁ।

একলা একলা এত ঘুরতে ভাল লাগে ?

ঘনশ্যাম হাসে। বলে বড়লোকেরা টাকার নেশায় সবকিছু করতে পারে।

তাই বলে মাসে বিশ-বাইশ দিন একলা একলা ঘুরে বেড়ান ?

সাহেবদের তিন ভাইকে খুব ঘুরতে হয়।

অন্য দু ভাই ?

ওরা কলকাতার বড় অফিসে থাকেন।

বড় সাহেবের কথা শুনে পান্না একটু বিষণ্ণ হয়। দুঃখ পয় অবসর সময় বড় সাহেবের কথা ভাবে। কখনও কখনও বাড়ীতে গিয়ে মথুরাকে বড় সাহেবের কথা বলে, জান বাবুজি, এখানকার কারখানা ছাড়াও বড় সাহেবকে নাগপুর আর বোমবাইয়ের কারখানা দেখতে হয়। মাসের মধ্যে বিশ বাইশ দিন ওকে ঘুরে বেড়াতে হয়।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। বড় সাহেব সাত-আট দিনের বেশী কলকাতায় থাকতে পারেন না।

কোটিপতি আদমীরা কী আমাদের মত বাড়ীতে বসে থাকতে পারে ?

শুধু মথুরার কাছে নয়, পুরানো বান্ধবীদের কাছেও পান্না বড় সাহেবের গল্প শোনায়। লছমী কৌশল্যা, রামপেয়ারী মুগ্ধ হয়ে শোনে। ওরাও পান্নার কাছে বড় সাহেবের নানা কথা জানতে চায়।

রামপেয়ারী বললো, বড় সাহেব খুব ঠাণ্ডা আদমী তাই না ?

হ্যাঁ বড় সাহেব ভীষণ কম কথা বলেন।

গত মাসে বড় সাহেব পাওয়ার হাউস দেখে কান্টিনের রসুই দেখতে এসেছিলেন।

তাই নাকি ? পান্না হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ। আমরা তো অবাক।

একলাই গিয়েছিলেন ?

না. সঙ্গে বর্মন সাহেব ছিলেন।

তারপর তোরা কী করলি ?

ব্যানার্জীবাবু ইসারা করতেই আমি বড় সাহেবকে মিঠাই খেতে দিলাম।

খেলেন ?

শুধু একটা বরফি তুলে নিলেন।

পান্না গম্ভীর হয়ে বললো, বড় সাহেব মিঠাই খান না।

তবে বড় সাহেব বলেছেন একদিন ক্যানটিনে খাবেন।

তা খেতে পারেন। কোটিপতি হলেও বড় সাহেব খুব সাদাসিধে আদমী। বিশেষ করে খানাপিনার ব্যাপারে কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে বলে, আচ্ছা !

শুধু পান্না লছমী কৌশল্যা বা রামপেয়ারী নয় শঙ্করগড়ের সমস্ত মানুষ, অযোধ্যা সিমেন্ট্ কোম্পানীর ছোট-বড় কর্মচারই বড় সাহেবকে শ্রদ্ধা করেন। ভালবাসেন। ওরা সবাই জানেন এই একটা মানুষের জন্য এতগুলো মানুষের অদৃষ্ট বদলে গেছে। শঙ্করগড়ের যারা এর আগে বজরায় দু-খানা মোটা রুটি আর এক লোটা জল খেয়ে দিন কাটাত, তারাও আজকাল রোজ বিকেলে থলি নিয়ে বাজারে যায়। আটা-গম শাক সবজী কেনে। শরীর খারাপ হলে ডিসপেন্সারীতে যায়।

নমস্কার ডকটর সাব।

তোমার আবার কী হলো ? দেখেত মনে হচ্ছে ভালই আছো।

কিষাণ একটু হেসে বলে, আমি ঠিক আছি মাগার বিবির ভবিয়ত ভাল নেই।

সে কোথায় ?

বাহার।

ভিতরে ডাক দাও।

পুষ্পা ভিতরে আসতেই ডাক্তার রায় চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেন, শরীর খারাপ হয়েছে।

জী।

কী হয়েছে।

কাম করতে ইচ্ছা করে না। রুটি খেতেও দিল লাগে না।

ভিতরের ঘরে যাও। আমি আসছি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার সাহেব ভিতরে যান। পুষ্পাকে পরীক্ষা করেন। একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে এসে কিষাণকে বলেন, ওর শরীর ঠিকই আছে তবে বাচ্চা হবে।

কিষাণ আর পুষ্পা ডাক্তারখানা থেকে কতগুলো ট্যাবলেট আর এক শিশি ওষুধ নিয়ে হাসতে হাসতে কোয়ার্টারে ফিরে যায়।

আগে ?

শঙ্করনাথের বটতলায় পূজা দিত আর পাশের গ্রামের কিশোরীলাল ওঝার কাছে ছুটে যেত।

বছর কয়েক আগে মালবোঝাই একটা লরী জি, টি, রোডের ধারে উল্টে গিয়েছিল। শঙ্করগড়ের মানুষ ছুটে গিয়ে লরীকে টেনে তুলে আবার মাল বোঝাই করেছিল। লরীর ড্রাইভার পাঁচটা করে টাকা দিয়েছিল। কিষাণও পেয়েছিল। শঙ্করনাথের মেলায় খরচ করবে বলে সবাই সে টাকা এক বছর লুকিয়ে রেখেছিল। আর এখন ?

শনিবার বিকালে অফিসের খাতায় টিপ সই দিয়েই কিষাণ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ টাকা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ও আর শুকদেব প্রায়

ছুটতে ছুটতে চলে যায়, ধুলিগাও-এর বাজারে। তর্ধেক টাকার সরাব খেয়ে অনেক রাত্রে ফিরে আসে। যারা নেশা করে না তারাও বাজার যায়। গামছা ভর্তি করে জিনিস কেনে, বিবিকে কাঁচের চুড়ি কিনে দেয়।

হীরা সৌখীন লোক। আগে রোজ রাত্রে ঢোল বাজিয়ে গান গাইত। শঙ্করগড়ের একদল মানুষ ওর চারপাশে বসে ওর গান শুনত। এখনও হীরা গান গায়, তবে হারমোনিয়াম কিনেছে কারখানার বন্ধুবান্ধবরা শুধু গান শোনে না, পেয়ালাভর্তি চা খায়। তুলসীদাসের ভজন শোনার জন্য মথুরা মাঝে মাঝে ওর ওখানে আসে। গান শোনে কিন্তু হীরার স্ত্রী চা দিতে এলেই বলে, সবে এক পেয়ালা চা খেয়েছি, আর খাব না।

হীরা অনুরোধ করে বড়ে চাচা, এক পেয়ালা চা খাও। কোন ক্ষতি হবে না।

না, না, হীরা, বেশী চা খাওয়া ভাল না।

চা খাবার সময় গান বন্ধ থাকে। নানা কথাবার্তা হয়। মথুরা বলে এক কালে এই শংকরগড়ের মানুষ ভাল পানি পর্যন্ত পেত না কিন্তু এখন ?

শুনে হীরাও হাসে। বলে সত্যি বড়ে চাচা। ক'বছর আগেও ভাবতে পারি নি আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইব।

মথুরা মাথা দলিয়ে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছিলেন—এই হচ্ছে সব চাইতে বড় ক্রান্তি। একেই সাচমুচ ইনকিলাব বলে।

হীরা গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ বড়ে চাচা কিন্তু হাতে পয়সা আসায় কিছু লোক খারাপও হয়ে যাচ্ছে।

আমি জানি হীরা ধলিগাও-এর বাজারে অনেকেই টাকা উড়িয়ে আসছে।

হ্যাঁ বড়ে চাচা ঠিকই বলেছ।

কান্তি যখন এসেছে তখন শুধু ভালই হবে তার তো কোন মানে নেই। কিছু খারাপ তো হবেই। মথুরা একটু শুকনো হাসি হেসে বলে, প্রদীপের আলোয় ঘরের অন্ধকার দুর হলেও প্রদীপের নীচে একটু অন্ধকার থাকবেই।

শুধু হীরা নয় সবাই মাথা নেড়ে মথুরার কথায় সম্মতি জানায়।

চুনার পাহাড়ের কিছু দুর থেকে লাইমষ্টোন আসছে রাজস্থান থেকে জিপসাম আসছে, ঝরিয়া-রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা আসছে আর অযোধ্যা সিমেন্ট ওয়াগন বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে চার-দিকে। রোজ, প্রতিদিন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস। দেখতে দেখতে দুটো বছর পার হয়ে গেল। এখন আর শংকরনাথের মেলার জন্য শংকরগড়ের মানুষে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে না। শংকরনাথের মেলার চাইতে বোনাস পাওয়া অনেক আনন্দের।

সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটা আরো একটু কালো হলো।

মথুরা ভোরবেলায় উঠে ঐ চিমনিটার দিকে আজও তাকিয়ে আছে। পান্না পাশে এসে দাঁড়াল কিন্তু মথুরা টের পায় না। ও বিভোর হয়েই চিমনির দিকে তাকিয়ে থাকে!

বাবুজি!

কিরে বেটি?

তুমি রোজ সকালে উঠে ঐদিকে এভাবে তাকি কি দেখ?

ঐ লম্বা চিমনিটা।

রোজ?

হাঁ রোজ।

রোজ রোজ কী দেখ?

প্রথম যখন কারখানা হলো তখন এই বিরাট লম্বা চিমনিটা দেখে ভীষণ ভাল লাগত। রাত্তির বেলায় যখন ওর মাথায় লাল আলো দেখতাম তখনই দূরের আউটার সিগন্যালের কথা মনে হতো কিন্তু হঠাৎ একদিন সাদা ধবধবে চিমনিটাকে কালো হতে দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কেন? কারখানার চিমনিতো কালো হবেই।

তা জানি কিন্তু মনে হয় আমরাও বোধহয় একটু একটু করে কালো হয়ে যাচ্ছি।

তার মানে?

তার মানে? মথুরা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, কারখানা হয়েছে বলে অনেক গরীব মানুষ খেতে পাচ্ছে, পাকা মোকানে থাকতে পারছে। কলের জল, বিজলির আলো ছাড়াও আরো কত কী পাচ্ছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু হারিয়েও যাচ্ছে।

কী হারিয়ে যাচ্ছে বাবুজি?

শংকরগড়ের মানুষগুলোও বদলে যাচ্ছে।

সে তো যাবেই বাবুজি!

যাবেই, তাই নারে বেটি? মথুরা আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

কিছু তো বদলে যাবেই বাবুজি।

বেটি তুইও বদলে যাবি?

পান্না চমকে ওঠে। আমি আয় কী বদলাব?

পান্না আর কথা বলে না, চলে যায় কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারে বাবুজি ঠিকই বলেছে। শংকরগড়ের মানুষগুলো সত্যি বদলে যাচ্ছে। ঐ সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটার মত মানুষগুলোও একটু একটু করে কালো হচ্ছে। ক'দিন আগে কিষাণ মদ খেয়ে

শুকদেবের বউকে নিয়ে টানাটানি করেছে, জানাজানি হবার পর পম্পা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওয়াকার্স কলোনীর সবাইকে জানিয়ে দিল, ঐ হারামজাদীই তো আমার আদমীর বারোটা বাজিয়েছে। ও ডাইনী টাকা পেলে সব করতে পারে।

শুকদেবের বউও চুপ করে থাকে নি, আরে চুপ চুপ! নিজের আদমীকে ধরে রাখতে পারিস না আবার চ্যাচাচ্ছিস?

কিষাণ বরাবরই এই ধরনের। সুযোগ পেলেই গ্রামের মেয়েদের বিরক্ত করতো। মথুরা রিটায়ার করার পর পান্না যখন শংকরগড় এলো তখন কারণে-অকারণে প্রায়ই কিষাণ আসত, বড়ে চাচা আছেন?

নেই। কই কাম থা?

কিষাণ বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, কাম তো থা···

জরুরী কিছু?

ও সে কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, ফিরবেন কখন?

ঠিক জানি ন।

আমি বরং একটু বসি।

পান্না আপত্তি করে না। কিষাণ বাইরের চারপেয়ীতে বসে থাকে কিন্তু বেশীক্ষণ না। একটু পরেই ঘরের দরজার কাছে এসে পান্নাকে জিজ্ঞাসা করত, আমি বাইরে একলা একলা চুপ-চাপ বসে থাকব?

আমি যে খানা বানাচ্ছি।

খানা তো পরেও বানাতে পারিস। হঠাৎ কিষাণ ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো. এখানে বসি?

পান্না একটু অবাক হয়। বলে, ঘরে কেন? বাইরে তো বেশ হাওয়া আছে।

কিষাণ একটু হেসে বলে, ঐ হাওয়াতে কি আমার দিল ঠাণ্ডা হয় ?

সব্জী কাটতে কাটতে পান্না চমকে উঠে। তাকিয়ে বলে, তার মানে ?

আবার সেই মুখ টিপে হাসি হাসতে হাসতে ও জবাব দেয় বাইরের হাওয়ার চাইতে তোর কাছে বসলেই আমার দিল বেশী ঠাণ্ডা হবে।

পান্না গর্জে ওঠে যা। বাহার যা।

রাগ করছিস কেন ? একলা একলা তোরও যেমন ভাল লাগে না তেমনি আমার ভাল লাগে না।

সব্জী কাটা ছেড়ে পান্না তেড়ে আসতই কিষাণ বেরিয়ে যায় কিন্তু আবার দু'চার দিন পরেই উদয় হয়।

বড় পিয়াস লেগেছে। একটু পানি পান্না ?

না।

কেন ?

গঙ্গার সমস্ত পানি খেলেও তোর পিয়াস যাবে না।

নির্লজ্জের হাসি হেসে কিষাণ বলে, তুই তাইলে বুঝেছিস ?

না তা কেন বুঝব ?

তাহলে এ পিয়াস মিটাবি তো ?

পান্না আর সহ্য করতে পারে না। ঝাঁটা হাতে করে তেড়ে এসে বলে, ঝাড়ু পিটিয়ে তোর পিয়াস মেটাব।

পান্না অতি সাধারণ গুমটিম্যানের মেয়ে। লেখাপড়া শেখে নি। অধিকার বা অনধিকারের তত্ত্ব সে জানে না কিন্তু প্রকৃতি তাকে শিখিয়েছে মৌমাছিরই ফুলের মধু খাবার অধিকার বা যোগ্যতা আছে, বোলতার নেই। সেই মৌমাছিকে মধু দেবার

জন্যই সে মনোহরলালের সংসারে গিয়েছিল কিন্তু স্বামীর সোহাগ পাওয়া যখন তার অদৃষ্টে জুটল না তখন আস্তে আস্তে, লুকিয়ে চুরিয়ে বোলতা আসতে শুরু করল। রাত একটু গভীর হলেই পিছনের দরজায় ঠুক্ ঠুক্ করে আওয়াজ হতো। প্রথম প্রথম পান্না ঠিক বুঝত না; ভাবত বোধহয় কুকুর-বেড়াল এসেছে। দু'চার দিন পরে আরো গভীর রাতে আবার সেই আওয়াজ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পান্নার ভয় করছিল। জেগে জেগেই শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু পরে আবার সেই আওয়াজ ঠুক ঠুক। এবার না উঠে পারল না। ভাবল, বোধহয় হীরাবতীর বাচ্চাটার জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে। বোধহয় সেজন্যই ডাকাডাকি করছে। ওর স্বামীও তো মনোহরলালের মতনই আরেক গুণধর। হত-চ্ছাড়া হয়ত বাড়ীই ফেরেনি।

ঘরের লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে বারান্দায় রেখে দরজার কাছে গিয়ে পান্না জিজ্ঞাসা করল, কে? হীরামতী? বাচ্চার বুখার বেড়েছে নাকি?

দরজার ওপাশ থেকে একটা আওয়াজ এলো কিন্তু ঠিক কী বললে, তা বুঝতে না পারলেও পান্না ভাবল হীরামতীই এসেছে। পান্না দরজা খুলতেই অবাক! কালো কালো দাঁত বের করে হাসছে ড্রাইভার কেদারনাথ। চিৎকার করতে পারল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে বাধা পেল।

একলা একলা তোর ডর লাগছে না? পরমাত্মীয়ের মত কেদারনাথ আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল।

একলা একলা থাকব কোন দুঃখে?

কেন মিছে কথা বলছিস পান্না? মনোহরলাল তো··

ওর কথাটা শেষ করবার আগেই পান্না ফিসফিস করে বললো

ষ্টেশনের এক বাবু আছে কাল আসিস।

সাচ ?

ঝুট বলে আমার কী লাভ ? আমি যে একলা রাত কাটাতে পারি না তা কি তুই জানিস না ?

কেদার দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে পান্নার থুতনি নেড়ে বললো, ছি ছি ! তুই একলা থাকবি কেন ?

এখন যা। কাল আসিস।

কাল যদি আবার ষ্টেশনের বাবু আসে ?

আমি কী বাবুর কেনা গোলাম যে রোজ রোজ···

তাহলে কাল আসব ?

জরুর, কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবি। বেশী রাত হলে ··

না, না, বেশী রাত করব না।

এখন যা ! বাবু টের পেলে ··

আচ্ছা যাচ্ছি।

দরজা বন্ধ করতে করতে পান্না বললে। আর কিছু না পারিস আমার জন্য কাঁচের চুড়ি আনিস।

জরুর, জরুর।

পরের দিন তো দূরের কথা, কেদারনাথ ড্রাইভার কেনদিনই সে চুড়ি দিতে পারল না।

আমাদের সমাজব্যবস্থা সত্যি বড় বিচিত্র। ঘরে অকর্মন্য, অপদার্থ দুশ্চরিত্র রোগগ্রস্ত স্বামী থাকলে মেয়েদের বিপদ নেই কিন্তু ঘর শূন্য হলেই কোন না কোন কেদারনাথের উৎপাতের হাত থেকে রেহাই নেই। চোরের মত চুপি চুপি কেউ না কেউ মনের দরজায় দেহের জানালায় উকি ঝুকি দেবেই। কিষাণকে দেখলেই পান্নার এইসব কথা মনে পড়ে।

মনোহরলালের ঔদাসীন্য, অবিচার, অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পান্না যখন বড় সাহেবের বাংলোয় থাকতে শুরু করল তখন ভাবল এবার নিশ্চিন্ত! হা ভগবান! বিবিজী বেরিলি গেলে একদিন মাঝরাতে স্বয়ং বুড়ো বড়ো সাহেব এসে হাজির ওর ঘরে!

বড়ে সাব, আপ? স্তম্ভিত, বিস্মিত হলেও অত্যন্ত চাপা গলায় পান্না জিজ্ঞাসা করল, তবিয়ত খারাপ লাগছে নাকি?

যে বড় ষ্টেশন মাষ্টারের গর্জনে গয়ার সমস্ত রেল কর্মী ভয়ে কাঁপে তিনিই বেড়ালের মত মিউ মিউ করে বললেন, না না, তবিয়ত ঠীকই আছে।..

তবে? কিছু দরকার আছে?

পা টিপে টিপে আমার ঘরে আসতে পারিস?

কিউ?

কিছুতেই নীদ আসছে না, তুই একটু আসবি?

এই নিস্তব্ধ অন্ধকার মধ্যরাত্রির আমন্ত্রণের অর্থ বুঝলেও না বলতে পারল না পান্না। বললো, আপনি যান, আমি আসছি।

জলদি আয়, দেরী করিস না।

আপ যাইয়ে, আমি আসছি।

ঘরে যখন আগুন লাগে তখন ভীরু কাপুরুষ, দুর্বলও অকস্মাৎ অসুরের মত সাহসী ও শক্তিশালী হয়। অনেক অসম্ভব কাজও সে অনায়াসে করে। পান্নাও করল। বড় সাহেব চলে যাবার একটু পরেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে উঠল, বড়ে সাব চোর। বড়ে সাব চোর। চোর, চোর..

শুধু বড় সাহেব নয়, সে চিৎকারে বাড়ীর সবাই বেরিয়ে এলেন। আশে-পাশের কোয়াটারেরও অনেকে জেগে গেলেন।

এদিক ওদিক ছুটাছুটি করলেন সবাই কিন্তু চোরের হদিশ পাওয়া গেল না। সবাই বললেন, পালিয়েছে! বাকি রাতটুকু সবাই সতর্ক হয়ে রইলেন। বড় সাহেবের মত বোলতাও পান্নার মধু খেতে পেলেন না, পারলেন না।

এসব কথা পান্না কাউকে বলে নি। কোন মেয়েই কাউকে বলে না। পান্না কিষাণকে শুধু বলেছিল, আমার কাছে ফালতু সময় নষ্ট না করে বরং রামপেয়ারীর কাছে যা।

অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটা কালো হবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি শঙ্করগড়ের মানুষগুলোও কালো হতে শুরু করল। বড় সাহেবের বাংলোয় সারাদিন কাটালেও পান্না সব খবর পায়। এখন আর কিষাণ, শুকদেব বা ওদের মত ফুর্তিবাজ লোকদের ধুলিগাও যেতে হয় না, রেলওয়ে সাইডিং-এর ওপাশেই সরাবের দোকান হয়েছে। দিনের বেলায় সব ফাঁকা কিন্তু সন্ধ্যার পর, একটু অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মানুষ মাছির মত ওখানে ভনভন করে। বড় কোঠীতে বসে বসেই পান্না মাঝে মাঝে তাদের চিৎকার, উল্লাস শুনতে পায়। জানতে পায় আরো অনেক কাহিনী।

বড় সাহেবের শোবার ঘরের এয়ার কণ্ডিশনারটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার পর পান্না ঘোষবাবুকে টেলিফোন করে বর্মনবাবুকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল কিন্তু বর্মনবাবু ব্যস্ত থাকায় দু'তিন দিন আসতে পারেন নি। ঘোষবাবু বলেছিলেন বড় সাহেব তো এখন আসছেন না, বর্মনবাবুকে ক'দিন পরেই পাঠাব। পান্না আপত্তি করে নি। কদিন পরে চৌকিদার এসে পান্নাকে বললো, দিদি ডিউটিতে আসার সময় বর্মনবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। বললেন, আজ বিকালের দিকে আসবেন।

আচ্ছা।

চৌকিদার তবু দাড়িয়ে রইল। দুচার পা এগিয়ে পান্না হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর কিছু বলবে ?

না তবে···। চৌকিদার কথাটা শেষ করতে পারল না।

তবে কি ?

চৌকিদার মুখ নীচু করে বললো, না, থাক।

পান্না বুঝল চৌকিদার কিছু বলতে দ্বিধা করছে। পিছিয়ে চৌকিদারের সামনে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কী এমন কথা যে বলতে তোমার বাধছে।

বলব ?

বলবে না কেন ?

দিদি, বর্মনবাবু এলে একটু সাবধান থেকো।

তার মানে ? পান্না অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

বুড়ো চৌকিদার মুখ ক'াচুমাচু করে বললো বলব ? তুমি কিছু মনে করবে না তো ?

না, না, কিছু মনে করব না বল।

দিদি, বর্মনবাবু লোকটা তত সুবিধের নয়...মানে বিশেষ ভাল না।

কী হয়েছে কী ?

বর্মনবাবু দিনের বেলায় ক্যান্টিনের খাবার খান, তো তুমি জান।

বোধহয় কেউ যেন বলেছিল কিন্তু ক্যান্টিনে খান তো কী হয়েছে।

রামপেয়ারী রোজ ওকে পাওয়ার হাউসে খাবার পৌঁছে দিতে যায় বলে—

ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য পান্না হাসতে হাসতে বললো রামপেয়ারী যখন ক্যান্টিনে কাজ করে তখন তো ওকে খাবার পৌঁছতে যেতেই হবে।

তাতো হবে কিন্তু রামপেয়ারীর সঙ্গে বর্মনবাবুর ..

বুড়ো চৌকিদার কথাটা শেষ করতে না পারলেও ইঙ্গিতটা বুঝতে পান্নার অসুবিধে হলো না। বললো যার যা ইচ্ছে করুক তাতে আমাদের কী ?

যাইহোক বর্মনবাবু এলে তুমি সাবধানে থেকো।

পান্না হাসতে হাসতে বললে' তুমি কি ভেবেছ আমিও রামপেয়ারী।

পান্না নিজের কাজে চলে গেলেও মনে মনে বুঝলো চৌকিদার ঠিকই বলেছে। কৌশল্যার কাছে আগেই ও অনেক কিছু শুনেছিল। রামপেয়ারীর বিয়ে হলেও স্বামীর ঘর করতে হয়নি ওর স্বামী বুঝি আমেদাবাদের এক কাপড়ের কলে কাজ করে কিন্তু রামপেয়ারী তার কাছে যায় না, সেও রামপেয়ারীর কাছে আসে না। বাবা বেঁচে থাকতে তবু একটু ভয় করত কিন্তু সে মারা যাবার পর রামপেয়ারীর পাখনা গজিয়েছে। বুড়ী মাকে ও কোনকালেই গ্রাহ্য করত না; অযোধ্যা কোম্পানীতে নোকরি পাবার পর তো কথাই নেই। কৌশল্যা নিজে চোখে প্রায়ই সন্ধ্যার পর রেল লাইনের ওদিকে যেতে দেখেছে রামপেয়ারী আর বর্মনবাবুকে।

বর্মনবাবু চীফ ইলেকট্রিক্যাল সুপারতাইজার। পাওয়ার হাউসের পিছন দিকে ওর আলাদা অফিস। কাজের জন্য ওকে যেতে হয় সব জায়গা। কারখানার ভিতরে-বাইরে সাহেবদের কোঠীতে ওয়ার্কারদের কলোনীতে, অফিসে ক্যান্টিনে

গুদামে সর্বত্র। বড় সাহেব কলকাতা থেকে এনেছেন বলে এখানকান সবই ওকে খাতির করেন। কেউ কেউ ভয়ও। হাজার হোক বড় সাহেব ওকে পছন্দ করেন। যখন তখন বড় কোঠীতে যায়। একেবারে বড় সাহেবের শোবার ঘরে পর্যন্ত চলে যায়। সবই ঠিক ওকে কোনকালেই পান্নার ভাল লাগে নি।

ঘনস্যাম চলে যাবার মাস খানেক পরের কথা।

সেদিন সকালে বড় সাহেব আসবেন বলে পান্না খুব ব্যস্ত ঘর-দোর ঠিকঠাক করে রান্নাঘরের গোছগাছ শুরু করতে করতেই বেলা পড়ে গেল। আলোর সুইচ দিয়েও আলো জ্বলল না। পান্না তো অবাক। চারটের সময় অফিস বন্ধ হয়। তাই পাওয়ার হাউসের ফোন করল বর্মনবাবু হ্যায় ?

নেই ?

কাহা বর্মনবাবু ?

ফাকটোরীকা অন্দর।

আসবার সঙ্গে সঙ্গে বড় কোঠী আসতে বলো।

বর্মনবাবু এলেন কিন্তু ইতিমধ্যে পান্না আরো দুবার টেলি-ফোন করেছে। ঘন্টাখানেক সময় পার হয়েছে।

অন্ধকার গাঢ় হবার পরই উনি এলেন। চৌকিদার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, দিদি বর্মনবাবু এসেছেন।

পাঠিয়ে দাও।

সাধারণতঃ সঙ্গে একজন মিস্ত্রী থাকে কিন্তু সেদিন বর্মন বাবু একলাই এলেন। সিঁড়ির নীচের ধাপে পা দিয়েই বললেন পান্না টর্চ আছে ?

কেন আপনার মিস্ত্রীর কাছে নেই ?

সব মিস্ত্রী কারখানার মধ্যে কাজ করছে। তুমি বারবার টেলিফোন করেছ শুনে ..

কী করব ' কাল সকালেই যে বড় সহেব ..

বর্মনবাবু স্বগতোক্তি করলেন, আজ যে কী হল! সব জায়গাতেই গণ্ডগোল! তারপর বললেন দেশলাই জ্বালতে পার ? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

পান্না দেশলাই জ্বেলে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াতেই বর্মনবাবু বললেন অত উপরে দেশলাই জ্বাললে কি নীচে কিছু দেখা যায় ? একটু নীচে এসো।

সেই সেদিনই পান্না বর্মনবাবুকে চিনেছিল। বুঝেছিল এর থেকে দূরে না থাকলে বিপদ আছে। সেই থেকেই ও সতর্ক থাকে। তবু বর্মনবাবু আকারে-ইঙ্গিতে কথায়-বার্তায় তার মনের বাসনা চেপে রাখতে পারেন না।

জান পান্না তোমাকে অনেকটা বাঙালী মেয়েদের মত দেখতে।

ভাল কথা।

তারপর মাছ-মাংস রাধতে পার। পান্না চুপ করে থাকে।

বর্মনবাবু চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন আমাকে একদিন মাছ রান্না করে দিয়ে আসবে।

মাছ দিয়ে যাবেন, রান্না করে দেব।

কেন আমার কোয়ার্টারে গিয়ে রান্না করতে পারবে না ?

না, তা হয় না।

কেন ? কী হয়েছে ? তুমিও সেদিন আমার ওখানেই খাবে।

পান্না হঠাৎ বলে একটু বেশী রাত হয়ে গেলে আপনার ওখানে থাকতে পাব তো ?

কিন্তু...

SHARIF BUILDERS
66/B, Swamibag;
Dacca-3

আমার এমন বদ অভ্যাস যে খাবার পরই শুয়ে পড়ি।

কিন্তু ...

কিন্তু কি ?

সত্যি তুমি...

আপনি যদি প্যার করে থাকতে বলেন তাহলে থাকব না কেন।

কিন্তু মথুরা ...

বলব আপনার ওখানে ছিলাম।

না, না, তা হয় না।

তাহলে তো আমারও থাকা হবে না বর্মনবাবু! আমি আবার ঝুট বলতে পারি না। পান্না মচকি হাসতে হাসতে বললো, বিশেষ করে প্যার করার কথা কোন মেয়েই চেপে রাখতে পারে না।

একটু শুকনো হাসি হেসে বর্মনবাবু বললেন, তুমি ত আচ্ছা মেয়ে। বেশী সত্যি কথা বললে ত বড়ই মুস্কিল।

পান্না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল কেন? রামপেয়ারীকে দিয়ে কাজ হচ্ছে না ?

বর্মনবাবু আর কথা বলতে পারেন নি।

পাকা আম যেমন হঠাৎ একদিন গাছ থেকে খসে পড়ে মথুরাও তেমনি একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এই পৃথিবীতে থেকে চলে গেল।

কেউ ভাবতেই পারে নি মথুরা এভাবে চলে যাবে। রায় সাহেবের কামরার বাইরে বসে সারাদিন ডিউটি দিয়েছে, সন্ধ্যার পর হীরার ভজন শুনেছে। প্রতিদিনের মত পান্নার সঙ্গে

গল্পও করল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ একবার আর্তনাদ করেই খাটিয়ায় লুটিয়ে পড়ল। আরো জোরে আর্তনাদ করল পান্না। চারপাশের মানুষ ছুটে এল। ক'মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারবাবুও এলেন কিন্তু তাকে ওষুধ ইনজেকশন দিতে হলো না। শুধু ডেথ সার্টিফিকেট লিখেই চলে গেলেন।

কাঁদতে কাঁদতে পান্না মুর্ছা গেল। চোখের জল ফেলল শঙ্করগড়েব মানুষ। দুঃখ প্রকাশ করলেন কারখনার সাহেববাবু কর্মীরা কিন্তু ভোরের সূর্য দেখা দিতে না দিতেই শংকরগড়ের মাটিতে মথুরা মিশে গেল।

এই পৃথিবীতে সব অপ্রত্যাশিত ঘটনাই অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যু তো কখনই নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। মানুষের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যের চাইতেও মৃত্যু অনেক বেশী সত্য। স্বাভাবিক। অবশ্যম্ভাবী। তবু মানুষ কাঁদে। আত্মহারা হয়, ব্যাকুল হয়, বিভ্রান্ত হয়। পান্নাও হলো। হবেই। এই পৃথিবীতে দিনে সূর্যের আলো, রাত্রে চাঁদের জ্যোৎস্না অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখে কিন্তু পান্নার জীবনে তো শুধু মথুরাই আলো দিয়ে গেছে। সেই দীপশিখাটি যখন দমকা বাতাস ওঠার আগেই নিভে গেল তখন পান্নার কাছে সারা পৃথিবীটা অন্ধকার, প্রাণহীন জড়পিণ্ড মনে হলো। দুঃখের দিন, বিপর্যয়ের রাতে পৃথিবীকে যতই নির্মম, প্রাণহীন, বিষণ্ণ, করুণ মনে হোক না কেন, আস্তে আস্তে এই পৃথিবীরই রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, মাধুর্য মানুষকে আবার মোহমুগ্ধ করে। শোকাতুর মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়, জীবনের মুখোমুখি হয়। সে হাসে, খেলে, কর্তব্য পালন করে। দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়, সাহস দেয়।

জীবনধারাটা একটু পাল্টে গেল ঠিকই কিন্তু পান্না আবার বড় কঠোর হাল ধরল। হাজার হোক অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর প্রথম কর্মচারী। বড় সাহেব মথুরার কোয়ার্টারে মথুরার স্মৃতিতে ওয়ার্কারদের জন্য একটা ক্লাব করে দিলেন। পান্না এখন বড় কোঠির সারভেনটস কোয়ার্টারে থাকে। ব্যবস্থা বেশ ভালই। ছোট ছোট দুখানা ঘর ছাড়াও রান্নাঘর, স্নানের ঘর, পায়খানা আছে। একদিক দিয়ে ভালই হলো। রোজ সকালে আর রাত্রে মাইলখানেক রাস্তা হাঁটাহাঁটি করার ঝামেলা রইল না। হঠাৎ কোন দরকার হলে দিনে দারোয়ান রাত্রে চৌকিদার আছে। নতুন করে পান্নার আবার ভাল লাগতে শুরু করল।

বড় সাহেব আসেন যান। যখন থাকেন না তখন কখনো পান্না পুরানো বন্ধুদের কাছে যায়। গল্প করে। কিছু বলে, কিছু শোনে। আবার ফিরে আসে বড় কোঠি। বুড়ো চৌকিদার জিজ্ঞাসা করে, কি দিদি, কোথায় গিয়েছিলে ?

পান্না হাসতে হাসতে বলে, হীরার বউয়ের একটা ছেলে হয়েছে যে !

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কবে ?

এখনও এক হপ্তা হয়নি। জান বড় ভাইয়া, ছেলেটা খুব সুন্দর হয়েছে। ঠিক হীরার মতই দেখতে হবে।

আচ্ছা ?

বড় ভাইয়া, তোমাকে কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

কি কাজ দিদি ?

তোমার ছেলেকে দিয়ে ধুলিগাঁও থেকে বাচ্চাটির জন্য এক জোড়া মল আনিয়ে দিতে হবে।

বুড়ো চৌকিদার হেসে বলে, আমি নিজেই এনে দেব।

তুমি আবার কষ্ট করে অত দূর যাবে ?

ধুলিগাঁও আবার দূর কোথায় ? আমরা কি মোটর চড়া সাহেব যে দু এক মাইল হাঁটতে হলেই ভয় পাব ?

পান্না নিজের ঘর থেকে দুটো দশ টাকার নোট ওকে দিয়ে বলে, যদি কম পড়ে তুমি দিয়ে দিও। আমি তোমাকে···

না, না, কম পড়বে কেন ? ছোট্ট এক জোড়া মল কিনতে কত আর লাগবে।

বড় সাহেব না থাকলে সময় যেন ফুরুতে চায় না পান্নার। রোজ ভাবে একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে কিন্তু এমনই স্বভাব হয়ে গেছে যে ঠিক সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গবে। ঘুম ভাঙ্গলে কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না। জোর করে শুয়ে থাকতে পারে না। জোর করে শুয়ে থাকলেও বড্ড অস্বস্তি বোধ করে। একটু কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করেই চোখমুখে জল দেয়। ঘরে একটা শ্রীকৃষ্ণের ছবি আছে কিন্তু পান্না কোনদিন ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। ওর ভাল লাগে না। মথুরা কিছু বললেই ও বলতো, শ্রীকৃষ্ণজী কি আমাকে দেখেছেন যে আমি ওকে দেখব ?

ও কথা বলতে নেই বেটি ?

কেন বলবো না বাবুজি ? ছোটবেলায় মাকে নিয়ে নিলেন, কোন অন্যায় না করলেও স্বামীর ঘরে ঠাঁই পেলাম না। ভবিষ্যতে আরো কত কি সহ্য করতে হবে তা কে জানে ?

মথুরা কি বলবে ? চুপ করে থাকত।

চোখে-মুখে জল দিয়েই পান্না বারান্দার উপর থেকে চৌকিদারকে ডাকে বড় ভাইয়া ?

কি দিদি ?

একটু দাঁড়াও, এক্ষুণি চা আনছি।

আগে আগে বুড়ো চৌকিদার বারণ করত কিন্তু এখন আর করে না। জানে ও চা না খেলে হয়ত পান্নাও খাবে না। মনে মনে কষ্ট পাবে দুঃখ পাবে।

দু গেলাস চা নিয়ে পান্না নীচে যায়। চা খেতে খেতে একটু-আধটু গল্পগুজব, কথাবার্তা হয়।

আচ্ছা বড় ভাইয়া রোজ রোজ রাত জাগতে তোমার খুব কষ্ট হয়, তাই না ?

বুড়ো চৌকিদার শুধু হাসে।

হাসছ কেন বড় ভাইয়া ? রোজ রোজ রাত জাগতে কি কারুর ভাল লাগে ?

বুড়ো চৌকিদার হাসতে হাসতেই বলে, অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি। এখন আর কষ্ট হয় না।

তুমি স্বীকার না করলেই কি কষ্ট হয় না ? যত অভ্যাসই হোক রাত জাগতে সবারই কষ্ট হবে।

রাত্রে ডিউটি দিই বলে মাইনেও তো বেশী পাই।

তা তো পাও কিন্তু ··

না দিদি, গরীবের সংসারে ঐ টাকার অনেক দাম। দুটো মেয়ের সাদী দিয়ে তো আমি শেষ হয়ে গিয়েছি কিন্তু বড় সাহেবের এই নোকরি পাবার পর এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি।

বড় ভাইয়া মধুমতীর ছেলেটা কত বড় হলো ?

সাত সাল।

এর মধ্যেই সাত সাল হয়ে গেল ?

নাতীর কথা বলতে গিয়ে আনন্দে গর্বে ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, সাত হলে কি হবে ? হারামজাদা বড় বদ-মাস হয়েছে।

পড়াশুনা করছে ?

হাঁ হাঁ। দুসরা ক্লাশে পড়ছে।

আমি যখন দেখেছিলাম তখন কত ছোট্ট ছিল কিন্তু কি দারুণ দুরন্ত ছিল !

হারামজাদা ভীষণ দুরন্ত আছে কিন্তু পড়াই-লিখাইতে খুব ভাল।

তাই নাকি ?

হাঁ দিদি ! ও হারামজাদা অনেক বড় হবে।

মধুমতীর কথা শুনলেই পান্নার মনে পুরানো দিনের স্মৃতির ঝড় ওঠে।

বুড়ো চৌকিদার—জগন্নাথ মথুরার প্রায় সমবয়সী হলেও পান্না ছোটবেলা থেকেই ওকে বড় ভাইয়া বলে। মথুরা অনেকবার বলেও ওর ডাক পালটাতে পারে নি। ছোট ভাইবোনের চাইতে একজন বড় ভাই পাবার লোভ ওর বরাবরের। জগন্নাথ বলত, ও যদি বড় ভাইয়া বলে ডেকে শান্তি পায় তো পাক। তার পর মথুরা আর কিছু বলত না। জগন্নাথও ওকে দিদি ডাকতে শুরু করল। গ্রামের অনেক লোক হাসাহাসি করলে জগন্নাথ বলত, একটা ছোট্ট মেয়ে যদি আমাকে চাচা না বলে বড় ভাইয়া বলে তাহলে কী গঙ্গার পানি শুকিয়ে যাবে ?

জগন্নাথের মেয়ে মধুমতী আর পান্না সমবয়সী। মাস ছয়েকের ছোট-বড়। খুব ছোটবেলায় যখন পান্না ওর বাবা-মার সঙ্গে শঙ্করগড় এসে শঙ্করনাথের মেলায় গিয়েছিল, তখন থেকেই মধুমতীর সঙ্গে ওর ভাব। মেলায় জগন্নাথ ছোট দোকান দিত।

কাঁচের চুড়ি চুলের ফিতা, আলতা, সিঁদুর, খেলনা। আরো কত কী। মধুমতী জগন্নাথের পাশে বসে বসে অবাক দৃষ্টিতে মানুষের ভীড় দেখত। পান্নাকে জগন্নাথের কাছে রেখে মথুরা স্ত্রীকে নিয়ে মেলায় ঘুরত। ওরা এসে দেখত মধুমতী আর পান্না দোকানের খেলনা নিয়ে খেলছে, হাসছে।

সেই তখন থেকে ওদের বন্ধুত্ব। মথুরা যখনই পান্নাকে নিয়ে শঙ্করগড় এসেছে সব চাইতে আগে ছুটে এসেছে মধুমতী। এসেই ঝগড়া করত মথুরার সঙ্গে চাচা, এত কাল পরে নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ল ?

কি করব বেটি! রেল কোম্পানীর নোকরি ফেলে তো যখন তখন আসতে পারি না।

চাচা এবার আর চট করে যেতে দিচ্ছি না। আর যদি সত্যি সত্যিই যেতে চাও পান্নাকে রেখে দেব।

যে কদিনই থাকুক পান্না আর মধুমতী সব সময় একসঙ্গে থাকত। খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব ঘুরে বেড়ান। কোন কোন-দিন দুজনেই একসঙ্গে রাত্রে শুতো। দুপুরের পর সূর্যের তেজ একটু কমলে ওরা জামগাছের দোলনায় দুলতে দুলতে কত কথা বলতো

জানিস পান্না, আমার সাদীর কথা হচ্ছে।

তাই নাকী ?

হ্যাঁ।

তোর সাদী করতে ইচ্ছে করে ?

হ্যা। অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ী পরতে পারব, সোনা-চাঁদির গহনা পাব।

সত্যি, সাদী হলে ভারী মজা। আমার সাদী কবে হবে রে মধুমতী।

আমি চাচাকে জিজ্ঞাসা করব।

তখন ওদের কতই বা বয়স। বড়জোর নয়-দশ। কিন্তু শাড়ী পরে দুজনেই। ঐ বয়সেই গ্রামের অনেক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। হয়। ওরা অনেকের বিয়ে দেখেছে। তাইতো ওরাও বিয়ের কথা বলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

খুব গম্ভীর চিন্তান্বিতা হয়ে পান্না ওকে জিজ্ঞাসা করে সাদীর পরে তুই আমার সঙ্গে গল্প করবি?

হ্যা।

যদি তোর আদমী বারণ করে?

না না, আমার আদমী অমন হবেই না।

এবার পান্না নিজের স্বামীর কথাই বলে, আমার আদমীও বারণ করবে না।

মধুমতী খুশীর হাসি হাসতে হাসতে বললো, আমাদের দুজনের আদমীই খুব ভাল হবে।

তখন শঙ্করগড়ের মাটিতে অযোধ্যা সিমেন্ট কারখানার লম্বা চিমনি মাথা উচু করে দাঁড়ায় নি। জামগাছের ছায়ায় বসে সারা দুপুর কাটিয়ে দেওয়াই ছিল ওদের মত মেয়েদের সব চাইতে বড় আনন্দ! তাছাড়া মা তো ছিল না। পান্না একলা একলা বাড়ীতে থাকতে পারত না। ঐ জামগাছের আলো ছায়ায় মধুমতীকে কাছে পাওয়াই ছিল ওর একমাত্র আনন্দ কিন্তু পরের বার যখন শঙ্করগড় গেল তখন মধুমতী নেই। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। পান্না একলা একলা বাড়ীতেই রইল। ঐ জামগাছের আলোছায়ায় কিছুতেই যেতে পারল না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পান্নারও বিয়ে হয়ে গেল। তার

কিছুকাল পরে একটি জরির শাড়ী আর নতুন সোনার গহনা পরে স্বামীর সংসার চলে গেল।

বছরখানেক পরে স্বামীর সঙ্গেই পান্না একবার হঠাৎ শঙ্করগড় এসেছিল। মথুরাও তখন ওখানে ছিল। জগন্নাথ মথুরার সঙ্গে গল্প করছিল। পান্নাকে দেখেই ছুটে গিয়ে মধুমতীকে খবর দিল। হাতের কাজ ফেলে মধুমতীও সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সহেলীর কাছে।

বেশী দিন নয়, মাত্র তিন-চার দিন বন্ধু আবার একসঙ্গে সেই জামগাছের আলোর-ছায়ায় বসে বসে অনেক, অনেক গল্প করেছিল।

মধুমতী জিজ্ঞাসা করল, তোর আদমী তোকে খুব প্যার করে, তাই না ?

পান্না বললো আগে তোর কথা বল।

না, না, তুই আগে বল।

পান্না মাথা নেড়ে বললো, তোর আগে সাদী হয়েছে, তুই আগে বল।

তোর নতুন বিয়ে হয়েছে। আগে তোর কথা শুনি।

শেষ পর্যন্ত মধুমতীই আগে নিজেই কথা বললো প্রথম দিন আমার কি ভয় লেগেছিল!

কেন ?

বা রে! অত বড় একটা পুরুষ-মানুষ দরজা বন্ধ করে কোন কিছু না বলেই হঠাৎ আমার পাশে শুতে এলে ভয় লাগবে না ?

ঠিক বলেছিস। প্রথম দিন আমারও খুব ভয় করেছিল।

কেন ? কি করেছিল ? প্যার করেছিল বুঝি ?

পান্না হাসতে হাসতে বললো আমার আদমী একটা ডাকাত তাছাড়া ভীষণ অসভ্য। ঐ এক নিশ্বাসেই ও মধুমতীকে প্রশ্ন করল: তোর আদমীও খুব অসভ্য ?

মিটমিট করে হাসতে হাসতে বললো, এক নম্বরের অসভ্য কিন্তু আমাকে খুব প্যার করে।

এসব বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। সেদিনের স্বপ্ন আজ মধুমতীর বাস্তব আর পান্নার সব স্বপ্ন সব আশা-আকাঙ্খা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। মধুমতীর স্বামী কাশীতে দপ্তরে কাজ করে, ছেলে সেজেগুজে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে আর পান্না ?

বড়া সাব ? চা বানাব ?

চা ?

আপনি বলছিলেন শির দরদ করছে তাই···

হ্যা। বড্ড মাথাব্যথা করছে।

চা খেয়ে একটু শুয়ে পড়ুন। ভাল লাগবে।

আচ্ছা দাও এক কাপ চা।

একটু পরেই পান্না ট্রেতে করে চা নিয়ে যেতেই বড় সাহেব বললেন, রাত্রে আর কিছু খাব না।

না, না, বড়া সাব! সারা রাত না খেয়ে থাকবেন না। তবিয়ত খারাপ...

চায়ের কাপে চুমকে দেবার আগেই বড় সাহেব ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তবিয়ত ঠিকই থাকবে।

মাগার আপনার জন্য আজ চিকেন...

চায়ের কাপে চুমকে দিয়েই উনি বললেন রোজ শুধু খাওয়া

আর কাজ ভাল লাগে না।

অন্য দিন হলে চা দিয়েই পান্না চলে আসত। আজ এলো না। বড় সাহেবের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। বললো রোজ রোজ এত কাম করলে তবিয়ত কি ঠিক থাকে? কাল আপনি আরাম করবেন। বিলকুল বেরুবেন না তবিয়ত ঠিক হয়ে যাবে।

বড় সাহেব একটু হাসলেন।

পান্না চলে গেল নিজের কাজে।

একটু পরেই শঙ্করগড়ের আকাশ থেকে সূর্যের শেষ আলোর চিহ্নটুকুও হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকটরীর হাজার হাজার আলো জ্বলে উঠল। পান্না রান্নাঘর, বারান্দা, ড্রইংরুমের আলো জ্বালিয়ে বড় সাহেবের শোবার ঘরের সুইচে হাত দিতেই উনি বললেন আলো জ্বালিও না।

পান্না আবার নিজের কাজে চলে গেল। একটু পরেই রান্না-ঘরে লাল আলো জ্বলতেই ও তাড়াতাড়ি বড় সাহেবের শোবার দরজায় দু একবার টোকা মেরে ভিতরে গেল। বড় সাহেব চোখ বুজে শুয়ে আছেন। পান্না খুব আস্তে ডাকল, বড় সাব।

বড় সাহেব চোখ মেলে তাকিয়েই বললেন আমার ঘরের দুটো টেলিফোনই বাইরে নিয়ে যাও।

মাগার যদি কেউ.....

বলে দিও আমি ঘুমুছি। ডাকতে বারণ করেছেন।

পান্না আর কোন কথা না বলে দুটি টেলিফোনই বাইরে নিয়ে গেল। রান্নাঘরে ঢুকতেই ক্রীং ক্রীং। করে বেরিয়ে এসে টেলিফোন ধরল, হ্যালো!

আমি রায় সাহেব কথা বলছি।

নমস্তে সাব।

বিজয়বাবুকে দাও।

বড় সাব শুয়ে আছেন।

বল আমি কথা বলব।

মাগার উনি ডাকতে মানা করেছেন।

রায় সাহেব ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

পান্নাও টেলিফোন রেখে রান্নাঘরে বড় সাহেবের রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে গেল। বোধহয় পাঁচ মিনিটও হয়নি আবার ক্রীং ক্রীং।

হ্যালো, আমি মুন্সীজী বলছি।

নমস্তে মুন্সীজী বড়ে সাব শুয়ে আছেন। ডাকতে মানা করেছেন।

কিন্তু উনি নিজেই আমাকে টেলিফোন করতে বলেছিলেন—বহুত জরুরী ব্যাপার।

বড় সাহেব নিজেই আমাকে বারণ করেছেন। আমি কি করব বলুন ?

পাঁচ-দশ মিনিট পর পরই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে। কাজকর্ম করতে করতে বারবার এসে টেলিফোন ধরতে পান্না বিরক্ত হয়ে যায়। অন্যদিন আটটার মধ্যেই বড় সাহেবের খাবার তৈরী হয়ে যায় কিন্তু আজ প্রায় ন'টা বেজে গেল।

বড় সাব !

বড় সাহেব চোখ বুজে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। কোন জবাব দিলেন না।

পান্না আবার ডাকল, বড়ে সাব !

এইভাবে শুয়ে শুয়েই বড় সাহেব খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, কে ?

জী, আমি পান্না। খানা আনব বড়ে সাব ?

না।

মাগার···

একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না।

একটা ফুল্কা আর একটু চিকন ..

না, না চিকন-টিকন খেতে ইচ্ছে করছে না।

তাহলে একটু সুপ আনি।

সুপ ?

হা বড়ে সাব !

আচ্ছা দাও।

পান্না তাড়াতাড়ি সুপ আনল। বড় সাহেব আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসতেই ও জিজ্ঞাসা করল, এখনও শির দরদ করছে ?

একটু কমেছে।

সুপ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল সুবা তবিয়ত ঠিক হয়ে যাবে।

বড় সাহেব সুপ খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ টেলিফোন করেছিলেন ?

অনেকে।

আমি শুয়ে আছি শুনে কেউ কিছু বললেন ?

না।

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন. আমি শুয়ে আছি জেনেও কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না আমার শরীর খারাপ কিনা ?

নেই বড় সাব !

চমৎকার। অথচ এরাই এমন ভাব দেখায় যেন আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

পান্না শুধু শোনে,। কিছু বলে না।

সুপ খাওয়া শেষ হলে বড় সাহেব যেন নিজের মনে মনেই বললেন, সারা জীবন কি শুধু বেইমানদের নিয়েই আমাকে কাটাতে হবে!

পান্না চলে এল।

সমস্ত কাজকর্ম নিজের খাওয়া-দাওয়া, ঘরদোরের দরজা-জানলা বন্ধ করতে করতে বেশ রাত হলো। পান্নার ঘড়ি নেই কিন্তু নাইট শিফট-এর সাইরেন বাজলেই বুজতে পারে দশটা বাজল। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দুরের বড় রাস্তায় সামান্য কয়েকজন দেখেই বুঝল সাড়ে দশটা বেজে গেছে। প্রতিদিনের মত বড় সাহেবের ঘরে খাবার জলের ফ্লাস্ক রাখতে গিয়েই পান্না একটু ঘাবড়ে গেল। বড় সাহেব আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়েও যেন শীতে কাঁপছেন। দু'এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর পান্না পাশের ঘরের আলমারী থেকে কম্বল এনে খুব সাবধানে বড় সাহেবের গায়ের উপর দিতেই উনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কে ?

আমি পান্না।

পান্না ?

জী।

বড্ড শীত করছে পান্না।

আউর একট কম্বল দেব বড় সাব ?

দাও।

সঙ্গে সঙ্গে পান্না আরো একটা কম্বল এনে দিবার পর জিজ্ঞাসা করল, বড় সাব ডাক্তার সাবকে খবর দেব ?

না, না, কোন দরকার নেই।

কলকাত্তা থেকে টেলিফোন এলে কি...

বড় সাহেব যেন একটু রেগেই বললেন, কলকাতায় খবর দিয়ে কি হবে ?

কি আর করবে ? পান্না ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এল। শুয়ে পড়ল কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। বড় সাহেবের কথাই ভাবছিল। শরীর খারাপ জ্বর হয়েছে। তবু কাউকে খবর দিতে দিলেন না। ডাক্তারবাবুকেও না, কলকাতাতেও না কিন্তু কেন ? ডাক্তারবাবু তো ওরই কর্মচারী। খবর দিলেই ছুটে আসতেন অথচ ডাক্তারবাবুর কথা বলতেই বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, না, না, দরকার নেই। কলকাতাতেই তো ওর বাবা-মা, ভাইবোন স্ত্রী-পুত্র সবাই। সেই কলকাতায় খবর দেবার কথা বলতেও বললেন ওখানে খবর দিয়ে কি হবে ? আশ্চর্য। পান্না ভেবে কোন যুক্তি পায় না।

রাত এখন কটা ? বোধহয় দেড়টা-দুটো বেজে গেছে। তবু পান্নার চোখের পাতা ভারী হয় না। শুধু বড় সাহেবের কথাই ভাবে। না ভেবে পারে না। ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে অনেক কথা অনেক প্রশ্ন ভীড় করে। বড় সাহেব কি ডাক্তায়বাবুকে পছন্দ করেন না ? কলকাতার বাড়ীর কেউই

ওকে ভালবাসেন না ?

রাত আরো গভীর হয়। পান্না তখনও ভাবে। ভাবতে ভাবতে কোন কুলকিনারা পায় না। বড় সাহেবের টাকার অভাব নেই, অভাব নেই লোকজন-আত্মীয় স্বজনের কিন্তু তবু রোগশয্যার পাশে কেউ নেই। উনি একলা, মিঃসঙ্গ। পান্না মনে মনে সমবেদনা বোধ না ককে পারে না।

হঠাৎ কার কথা শুনে ও চমকে উঠল। এত রাত্রে কেউ এল নাকি ? নীচে থেকে বুড়ো চৌকিদার—বড়ে ভাইয়া কিছু বলছে নাকি ?

দু'এক মিনিট কান খাড়া করে রইল। হ্যাঁ, আবার সেই রকম কথা ! বড় সাহেব কিছু বলছেন নাকি ? পান্না তাড়াতাড়ী উঠে ওর ঘরের দিকে গেল।

বারান্দা পার হয়ে ড্রইংরুমে পা দিতেই পান্না আরো স্পষ্ট শুনতে পেল বড় সাহেবের গলা। বুঝতে পারল ওর জ্বর বেড়েছে, বোধহয় আরো বেশী যন্ত্রণা বোধ করছেন সারা শরীরে। বড় সাহেবের শোবার ঘরের দরজার বাইরে থেকেই পান্না আস্তে আস্তে ডাকল, বড়ে সাব !

কোন জবাব নেই।

আবার ডাকল, বড়ে সাব ! বড়ে সাব !

জবাব এলো না কিন্তু কাতরানি শুনতে পেল।

পান্না দরজা খুলে একটু উকি দিতেই দেখল বড় সাহেব ছটফট করছেন। নাইট ল্যাম্পের সুইচ টিপে দিতেই দেখল কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে অস্পষ্টভাবে কি যেন বলছেন। পান্না একটু এগিয়ে গেল। ডাকল, বড়ে সাব। বড়ে সাব।

না, কেন জবাব নেই। উনি আপন মনেই কি যেন বকবক করে চলেছেন।

আরো একটু কাছ এগিয়ে একটু ঝুকে পড়ে ডাকল, বড়ে সাব! শরীর খারাপ লাগছে?

কে?

আমি পান্না।

একটু জল দাও তো। বডড পিপাসা লেগেছে।

পাশের ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে এগিয়ে ধরল।

বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে গেলাস ধরলেন না, উঠেও বসলেন না। শুয়ে শুয়েই হা করলেন। পান্না একটু একটু করে ওর মুখে জল ঢেলে দিল। শেষবারে মুখ থেকে একটু জল গড়িয়ে পড়তেই পান্না তাড়াতাড়ী মুছিয়ে না দিয়ে পারল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল!

এর আগে কোনদিন বড় সাহেবকে ছোয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। আজ এই গভীর রাত্র অসুস্থ বড় সাহেবকে হঠাৎ ছুঁয়েও পান্না মনে মনে অনুতপ্ত না হয়ে পারল না কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই অনুতপ্ত মন বিস্মিত হয়ে গেল। বড় সাহেবের শরীর যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! কিংকতব্যবিমূঢ় হয়ে ও দাড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণের জন্য কিছুই ওর মাথায় এল না। তারপর একবার ভাবল ডাক্তারবাবুর কোয়াটারে টেলিফোন করবে। না, থাক। যদি বড় সাহেব সত্যি সত্যিই রেগে মান? হয়ত ডাক্তারবাবু ও পান্না—দুজনেরই চাকরি যাবে। দরকার নেই ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে। আরো কত কি ভাবল শেষ পর্যন্ত জল আর ন্যাকড়া এনে মেঝেয় বসে বসে বড়

সাহেবের কপালে জলপটি দিতে শুরু করল। গায়ে এতই জ্বর যে মিনিটে মিনিটে জলপটির ভেজা ন্যাকড়া শুকিরে যাচ্ছিল। পান্না সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিজিয়ে দিতে লাগল।

ঘরে একটা একটা ছোট মিটমিটে আলো জ্বলছে। বড় সাহেব জ্বরে বেহুস। পান্না মেঝের বসে ওর কপালে জলপটি দিতে এক মনে ওকেই দেখছে। এমনভাবে তো ও কোনদিন বড় সাহেবকে কাছেও পায় নি দেখেও নি। তাইতো বিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। এভাবে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? কে তুমি?

বড় সাব আমি পান্না!

বডড মাথা ব্যথা করছে। একটু মাথা টিপে দেবে?

জরুর।

সঙ্গে সঙ্গ পান্না বড় সাহেবের মাথা টিপে দিতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পরে মনে হলো জ্বর কমে আসছে আরো কিছু-ক্ষণ পরে একটু একটু ঘুম হতে শুরু করল। পান্না মনে মনে একটু স্বস্তি পেল।

একটু এপাশ-ওপাশ করার পর বড় সাহেব বললেন বডড গরম লাগছে। কম্বলগুলো সরিয়ে দাও তো।

বড় সাব, একটু পরে।

বড্ড গরম লাগছে যে।

বুখার ছেড়ে যাচ্ছে কিনা, তাই.....

একবার কম্বলগুলো উঠিয়ে নাও তো। আমি ব্যথরুম যাব।

পান্না কম্বল আর চাদর তুলে নিতেই বড় সাহেব বেশ কষ্ট করেই উঠে বসলেন কিন্তু দাঁড়াতে গিয়েই আবার বসে পড়লেন। একটা হতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পান্না, একটু ধরবে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল।

দু'হাত দিয়ে বড় সাহেবকে ধরে ও বললো, এখনও বেশ বুখার আছে। মাথা তো ঘুরবেই।

বড় সাহেবকে বাথরুমের ভিতরে দিয়ে পান্না বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরেই দরজার ওপাশ থেকে বড় সাহেবের গলা শোনা গেল, পান্না একটু ধর তো!

পান্না দরজা খুলে এক পা এগিয়ে বড় সাহেবের একটা হাত ধরতেই উনি আরেকটা হাত ওর কাঁধে রাখলেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পান্না ওকে ধরে ধরে বিছানার শুইয়ে চাদর-কম্বল দেবার পরই বড় সাহেব বললেন একটু মাথা টিপে দেবে ?

জরুর বড় সাব।

মেঝেয় বসে বসে পান্না বড় সাহেবের মাথা টিপে দিচ্ছিল কারুর মুখেই কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে বলতে পার ?

পান্না উঠে গিয়ে টেবিল লাইটের আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখে বললো, সাড়ে তিন।

সাড়ে তিনটে।

জী।

তুমি ঘুমুবে না ?

এক রাত ঘুম না হলে আমার কিছু হবে না।

কিচ্ছু হবে না বললেই কি হয় ?

তুমি যাও শুয়ে পড়।

বড় সাব আপনি ঘুমিয়ে পড়লেই আমি চলে যাব।

কাল সারাদিন রোদ্দুরের মধ্যে ঘুরাঘুরি করেছি বলেই হঠাৎ এরকম জ্বর হলো। তোমার কোন চিন্তা নেই।

কাল সারাদিন আপনি বাড়ীর বাইরে যেতে পারবেন না।

বড় সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?

নেই বড় সাব, তাহলে আবার তবিয়ৎ খারাপ হবে।

সারাদিন বাড়ীর মধ্যে থেকে কি করব ?

কাল সারাদিন আপনি আরাম করবেন।

সারাদিন আরাম করব ?

জী বড়ে সাব।

বড় সাহেব আর কথা বললেন না। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ক'দিন পরে শঙ্করগড় থেকে চলে যাবার আগে বড় সাহেব পান্নাকে ডাকলেন। পান্না যেতেই একটা একশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে বললেন, এটা তুমি নাও।

কেন বড় সাব ?

তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করলে তাই.....

পান্না মুখ নীচু করে বললো, মাফ করবেন বড়ে সাব।

আপনার সেবা করতে পেরেছি তাই যথেষ্ট। আমার কিছু চাই না।

বড় সাহেব দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে পারলেন না। মিনিটখানেক পান্নার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দিনে দিনে শঙ্করগড় আরো কত বদলে গেল। ছেলেদের স্কুল হলো, মেয়েদের স্কুল হলো লাইব্রেরী হলো। সকালবেলায় ছেলেমেয়েরা বইখাতা নিয়ে দল বেঁধে স্কুলে যায়, বিকালে ফিরে আসে। রোজ বিকেলবেলায়, সন্ধ্যার পর কারখানার লোকজনে লাইব্রেরী ঘর ভরে যায়। সপ্তাহে এক-দিন পুরুষদের জন্য লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ, খোলা থাকে মেয়েদের জন্য।

শঙ্করগড়ের বিপ্লব ইনকিলাবক্রান্তি এখানেই থামল না। আরো এগিয়ে গেল। লাইমষ্টোন ডিপোর পাশের খোলা মাঠ কংক্রীটের থাম আর তার দিয়ে ঘেরা হলো। শুরু হলো ফুট-বল খেলা। এখন রোজ বিকেলবেলায় এই ডিপোর মাঠে কয়েকশ মানুষ। তারা ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে চিৎকার করে হাততালি দেয় কখননো কখনো ঝগড়াটিও কয়ে নিজেদের মধ্যে। তারপর বর্মনবাবু গিয়ে মিটমিট করে দেন।

ফুটবল খেলার শীল্ড-কাপ-মেডেল দেবার দিন শুধু শঙ্করগড় নয়, আশে-পাশের সব গ্রামের মানুষ এসে জড় হয় ডিপোর মাঠে। কম্পিটিশনের খেলা আগেই শেষ। সেদিন খেলা হয় ওয়ার্কার্স আর অফিসারদের মধ্যে। ওয়ার্কার্সরা বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে মাঠে আসে অনেক আগেই। তারপর অফিসারদের বৌ-

ছেলেমেয়েরাও সেজেগুজে এসে চেয়ারে বসেন। শঙ্করনাথের মেলার মত মাঠের চারপাশে দোকানীদের ভীড় হয়। পান-বিড়ি সিগারেট ছাড়াও কত রকমের খাবারের দোকান বসে। চারটে বাজার দশ পনের মিনিট আগেই দু দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনা বেড়ে যায়। এই বিশেষ মেলার বহুজনের অনুরোধ কর্মীদলের অধিনায়কত্ব করেন করেন স্বয়ং বড় সাহেব। উনি ছাড়া বাকী দশজনই কারখানার কর্মী। অফিসারদের অধিনায়ক হন জেনারেল ম্যানেজার রায় সাহেব এই বিশেষ প্রদর্শনী খেলায় অফিসাররাই হেরে যান। কর্মী-দলের পক্ষ থেকে অধিনায়ক বড় সাহেব যখন মিসেস রায়ের হাত থেকে পুরস্কার নেন তখন আনন্দে কর্মীরা ফেটে পড়েন। এরপর ফটো তোলা ও খাওয়াদাওয়া আছে।

শঙ্করগড় অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর এইসব বিবর্তনের পিছনে ছোট একটি কাহিনী আছে। বাইরের কেউ তা জানেন না।

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। বড় সাহেব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে যাবার একটু অরেই পান্নাকে ডাকলেন।

বড়ে সাব আপনি ডেকেছেন?

এক্ষুনি একবার বর্মনকে আসতে বল তো। আলো জ্বালাতে গিয়ে হাতে শক লাগল।

বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই পান্না পাওয়ার হাউসে টেলিফোন করল বর্মনবাবু কি কোয়াটারে?

কোয়াটারে।

লাইনটা ওর কোয়াটারে দিন।

কোয়ার্টারে লাইন দিতেই পান্না ওকে বললো, বড় সাহেব এক্ষুনি আপনাকে ডাকছেন।

কেন ?

আলো জ্বালতে গিয়ে বড় সাহেব ভীষণ শক খেয়েছেন।

আচ্ছা আসছি।

পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই সাইকেল চড়ে বর্মনবাবু বড় কোঠীর গেটে হাজির হলেন। বড় সাহেবের অনুমতি ছাড়া এত রাত্রে কেউ বড় কোঠিতে ঢুকতে পারেন না। চৌকিদার পান্নাকে ডেকে বর্মনবাবুর আসার খবর দিতেই ও বললো, উপরে পাঠিয়ে দাও। বর্মনবাবু উপরে এসেই বড় সাহেবের বেডরুমে চলে গেলেন।

সার, ডেকছেন।

হ্যাঁ বসো। তুমি বোধহয় জান কিছু কিছু এলিমেন্টস ইতি-মধ্যেই যাতায়াত শুরু করেছে।

বর্মনবাবু হেসে বললেন, জানি সার। তবে ওরা কিছু সুবিধে করতে পারছে না।

সে যাই হোক বাইরের কেউ কিছু করার আগেই তুমি কিছু কর।

পরের দিনই বড় সাহেব এলেন। শ্রমিক কর্মী অফিসারদের নিয়ে সারা দিন মিটিং করার পর। বড় অফিসের সামনের মাঠে সবার সামনে ঘোষণা করলেন, এ কারখানা আমার ও আপনাদের। আমি অর্থ দিয়েছি, আপনারা দিচ্ছেন পরিশ্রম এ কারখানার উন্নতি ও কল্যাণে আমাদের সবারই স্বার্থ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি,

বড় সাহেব আবার শুরু করলেন, আপনারা বিশ্বাস করুন, এই কারখানার পাকা বনিয়াদ তৈরী করার কাজে আমি, জেনারেল ম্যানেজার সাহেব ও অন্যান্য অফিসাররা এতকাল এত ব্যস্ত ছিলাম যে আপনাদের অনেক সুখ-সুবিধার দিকেই আমরা নজর দিতে পারি নি। কারখানার বনিয়াদই যদি পাকা না হয় তাহলে আপনাদের সুখ-সুবিধা দেব কেমন করে।

সম্মতিতে সবাই মাথা নাড়লেন।

কারখানার আরো অনেক কথা বলার পর বড় সাহেব জানালেন ক্যান্টিন জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যান্য অফিসার দের জন্য নয়—ক্যান্টিন আপনাদের আপনারাই এর পরিচালনা করবেন।

হাততালী।

ক্যান্টিনের কর্মচারীরাও কারখানারই কর্মচারী তাদের মাইনে বোনাস আমরাই দেব কিন্তু বর্মনবাবুর সভাপতিত্বে যে ক্যান্টিন কমিটি হবে তাতে শুধু আপনারাই থাকবেন। কারখানার তরফ থেকে একমাত্র ওয়েলফেয়ার অফিসারই সে কমিটির সদস্য হবেন।

বর্মনবাবু চিৎকার করে উঠলেন বড় সাহেব।

সবাই বললেন, জিন্দাবাদ!

বড় সাহেব!

জিন্দাবাদ!

বড় সাহেব!

জিন্দাবাদ!

এরপর যখন বড় সাহেব ঘোষণা করলেন তিন মাসের মধ্যেই আমরা ছেলে-মেয়েদের স্কুল লাইব্রেরী ও খেলাধুলার

ব্যবস্থা করব তখন আনন্দে শ্রমিক কর্মীরা উন্মাদ হয়ে উঠল। সবশেষে উনি শুধু বললেন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা সবাই আপনাদের জন্য যথাসাধ্য করব কিন্তু আশা করব আপনারাও কারখানার জন্য যথাসাধ্য করবেন। আর মনে রাখবেন জেনারেল ম্যানেজার সাহেবই আপনার নিত্যকার বন্ধু ও অভিভাবক।

বড় সাহেব তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। বর্মনবাবুও তাঁর কথা রেখেছিলেন। ইউনিয়ন হলো এবং উনিই তার সভাপতি হলেন। ক্যান্টিনে খাবার-দাবারের দাম কমাল। শুরু হলো সমবায় বিপণি। চাল-ডাল তেল-নুন আটা-গম সাবান-তৈল মশলা স্কুলের বইখাতা মিলের কাপড় তাতের শাড়ী কেরোসিন লণ্ঠন টর্চলাইট। এক কথায় যে যা চায় তাই পায় তাও আবার ঠিক দামে। একটা ফুটো পয়সার এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। ফুটো পয়সার জিনিস কিনলেও রসিদ দেয়। কারখানার শ্রমিক কর্মীদের কাছে বর্মনবাবু এখন সাক্ষাৎ ভগবান। সবার মুখেই ওর প্রশংসা সত্যি একটা মরদকা বাচ্চা।

একদিন ক্যান্টিন কমিটির মিটিং শেষ হবার পরই সামনে বর্মনবাবু রামপেয়ারীকে বললেন, রোজ রোজ ক্যান্টিনে খেয়ে তো শরীর গেল। তুমি আমাকে একটু ডাল-ভাত রেধে দিতে পার ?

রামপেয়ারী কিছু বলার আগেই ক্যান্টিন কমিটির তিন-চারজন সদস্য প্রায় এক সঙ্গেই বললেন ক্যান্টিনে কাজ করা আর আপনার রান্না করে দেওয়া তো একই ব্যাপার ! এবার রামপেয়ারীর দিকে তাকিয়ে ওরা বললেন, কাল থেকেই তুমি প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে রান্না করবে।

বর্মনবাবু গ্যাকামী করে ক্যান্টিন ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে

বললেন, আমার রান্না করবার জন্য ওর ক্যান্টিনের কাজের ক্ষতি না হয়। ম্যানেজার বললেন না স্যার আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

বর্মনবাবু বললেন, তবে আমার ওখানে তো খুব বেশী সময় লাগবে না। দুপুরের দিকে ঘন্টা দুই আর বিকেলের দিকে বড়জোড় ঘন্টাখানেক।

প্রথম প্রথম বর্মনবাবুর বাড়ীতে রান্নাবান্না করেও কিছু সময়ের জন্য ক্যান্টিনে যেত। টুকটাক কাজকর্ম ও করতো। তারপর আস্তে আস্তে ক্যান্টিনে যাওয়া কমতে শুরু করল, বর্মনবাবুর বাড়ীর কাজ করে রামপেয়ারী ঘুরে বেড়ায়, গল্প করে বন্ধুদের সঙ্গে। কখনও চলে যায় গিরিজার চায়ের দোকানে।

শুকদেব হাসতে হাসতে বলে, কিরে রামপেয়ারী এতদিন পরে আমাকে মনে পড়ল ?

টিনের কৌটো থেকে একটা বিস্কুট নিয়ে রামপেয়ারী বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে বললো তোর কথা ভেবে ভেবে আমি কত রোগা হয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছিস না ?

ওর কথায় গিরিজা কিষাণ ও আরো দুতিনজন হেসে উঠল।

শুকদেব হঠাৎ বলে, তুই চব্বিশ ঘন্টাই তো বর্মনবাবুর সেবায় ব্যস্ত। কখন তোর খোজ নেব বল ?

কথাটা শুনে সবাই মিটমিট করে হাসলেও রামপেয়ারী তা খেয়াল না করেই বললো, ঠিক আছে। আমি এখনই বর্মন-বাবুকে বলছি যে শুকদেব বলছিল···

ঐটুকু শুনেই শুকদেবের বুক কেঁপে উঠল, মুখ পাংশুবর্ণ

হয়ে গেল ! শুকনা গলায় কোনমতে বললো, তোকে আমি কত প্যার করি আর তুইই আমার সর্বনাশ করবি ?

এক টুকরো বিস্কুট মুখে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তুই পাগল হয়েছিস ? তোর সর্বনাস আমি করব ? আমি বর্মনবাবুকে শুধু বলব শুকদেব আমাকে.....

শুকদেব যেন আর শুনতে চায় না। ওর কথাটা শেষ না হতেই জিজ্ঞাসা করল চা খাবি ?

দিতে বল।

আরো একটা বিস্কুট খাবি ?

আর কিছু দিবি না ? শুধু চা বিস্কুট ?

এতক্ষণে শুকদেবের হৃৎপিণ্ডটা আবার ওঠা-নামা শুরু করে। একটু হাসে। বলে তোকে আরো কত কি দেব। কিন্তু কিষাণ আছে বলে .....

ঠিক আছে পরে লুকিয়ে দিস কিন্তু ভুলে যাস না যেন।

ভগবান কী কসম। তোর কথা আমি ভুলব ?

বর্মনবাবু এখন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। নিজের কাজকর্ম ছাড়াও হাজার কাজ। ক্যান্টিন আর সমবায় বিপণির জন্যই প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা সময় চলে যায়। কোয়ার্টারে থাকলেও মিনিটে মিনিটে লোক আসে। রাত আটটা-সাড়ে আটটা বা ন'টা পর্যন্ত লোকজন থাকলে বর্মনবাবু হঠাৎ ডাকেন, রাম-পিয়ারী !

মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে রাম-পিয়ারী দরজার গোড়ায় দাড়িয়ে বলে জী বাবুজি !

রাত হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার খাবার ঢেকে রেখে কোয়ার্টারে চলে যাও !

পরশু ভী তো খানা ঢেকে গিয়েছিলাম কিন্তু.....

বর্মনবাবু হাসতে হাসতে বললেন পরশু সব লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এত রাত হয়ে গেল যে....—

উপস্থিত সাকরেদরা সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমরা বসছি আপনি খানা খেয়ে নিন।

খাবার আগে আমি স্নান করি। তাছাড়া একবার পেটে ভাত পড়লেই আমি ঘুমে ঢুলতে শুরু করব।

রামপিয়ারী বললো বাবুজী আমি আস্তে আস্তে খানা গরম করছি। আপনি কথাবার্তা বলে আস্নান করতে যান।

না, না, এক্ষুনি খাবার গরম করো না।

এসব শোনার পর সাকরেদরা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমরা আজ চলি। আপনি খাওয়া-দাওয়া.....

তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

বর্মনবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও ওরা চলে যায় রামপিয়ারীও চলে যায়, তবে আরো দেড়-দু ঘণ্টা পরে। বর্মনবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে একটু আদর-যত্ন করে যেতে যেতে একটু দেরী তো হবেই।

প্রকাশ্যে না হলেও চুপি চুপি সবাই রামপেয়ারীকে নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু শুকদেবের বউও কম নয়। স্বামী নেশা করে টাকাকড়ি উড়িয়ে দেয়, সংসার চলে না। তাই ও দু-এক বাবুর বাড়িতে কাজ করার পর ষ্টোরবাবুর বাড়ী কাজ নিল। কিছুদিন পরেই ষ্টোরবাবুর বউয়ের বাচ্চা হবে বলে কলকাতা চলে যাবার পরই শুকদেবের বউ রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘরে যাতায়াত শুরু করল।

প্রায় বছর খানেক পরের কথা। হঠাৎ একদিন ধোপা

ঘোষবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, মাইজী ষ্টোরবাবুর বিবি আসবেন না ?

ষ্টোরবাবুর বিবির খবরে তোর কি দরকার ? ঘোষবাবুর বর্ষীয়সী গিন্নী একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার কোন দরকার নেই মাইজী কিন্তু উনি তাড়াতাড়ী এলেই ভাল।

কেন ?

অনেক ইতস্তত করে ও বললো, শুকদেবের বউ মেয়েটা ভাল না।

তার মানে ?

মাইজী, আমি বুড়ো হয়েছি। ভাল-মন্দ বুঝি। তাই—না বলে পারছি না.....

ঘোষবাবুর গিন্নী যেন আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। তাই বললেন, এত ভনিতা না করে আসল কথাটা বল।

ও তখন সোজাসুজি বলে দেয় ষ্টোরবাবুর বিবি প্রায় এক বছর নেই কিন্তু বিছানার চাদরে বালিশের তোয়ালেতে সব সময় সিদুর.....

সেকি ?

ভগবান কী কসম ! আমি মিথ্যে কথা বলছি না। আপনি বিশ্বাস না করলে এক্ষুনি কাপড়ের বাণ্ডিল খুলে দেখিয়ে দিতে পারি।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঘোষবাবুর গিন্নী একটু ভাবলেন, তারপর বললেন ঠিক আছে তুই যা কিন্তুআমাকে একথা বলেছিস কাউকে বলিস না।

না, না, কাউকে বলব না।

পরের দিন ঘোষবাবু ষ্টোরবাবুকে অফিসে ডেকে বললেন. ছাখ সুকুমার তোমাকে একটা কথা অনেক দিন ধরেই বলব ভাবছি কিন্তু এখন না বলে পারছি না।

ঘোষবাবু অফিসের বড়বাবু। তার ঐকথা শুনেই সুকুমার দত্তের মুখ শুকিয়ে গেল। শ্বশুরের দৌলতে চাকরি পেয়ে তারই মেয়েকে বিয়ে করেন। এই ঘোষবাবুর কৃপায় সুকুমার দেড়শ টাকা বেশী মাইনেতে এখানে ষ্টোরবাবু হয়ে এসেছে। এখন সেই ঘোষবাবুই যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তো ....

গম্ভীর হয়ে ঘোষবাবু বললেন, তুমি যে সব সাপ্লায়ারের কাছ থেকেই বেশ টু পাইস নিতে শুরু করছ তা বড় সাহেবের কানেও পৌছেছে। তোমার জন্য সাপ্লায়াররা হয় খারাপ মাল দিচ্ছে নয়ত কম মাল দিচ্ছে তা তো তুমি ভাল করেই জান।

সুকুমার দত্ত চুপ!

ঘোষবাবু এর পরে ও থামলেন না। বললেন এখানে ফাকি দিয়ে, চুরি করে বেশী দিন চাকরি রাখা যায় না। তাছাড়া বৌমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে তুমি কি লাগিয়েছ বলতো? ছি ছি!

ঘোষবাবুর ঐ এক ডোজেই সিধুদার জামাই সিধা হয়ে গেল কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়।

পাকা মোকান আর বিজলী বাতী শঙ্করগড়ের মানুষগুলোকে সত্যি বড় লোভী করে তুলল। বড় সাহেব না থাকলে বুড়ো চৌকিদার পান্নাকে বলে দিদি মথুরা ঠিকই বলতো কারখানার চিমনিটার মত শঙ্করগড়ের মানুষগুলোও কালো হয়ে যাচ্ছে।

আবার কী হলো?

বুড়ো জগন্নাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো দিদি তুমি মথুরার মেয়ে। আমার মধুমতীর সহেলী। তোমাকে কি সব কথা বলতে পারি ?

পান্না বুঝতে পারে। চুপ করে থাকে। আর কোন প্রশ্ন করে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বুড়ো জগন্নাথই আবার বলতে শুরু করে আগে ভাবতাম পড়া লিখা জানা লোকেরা ভাল হয় কিন্তু এখন দেখছি সব পড়া-লিখা জানা লোকেরাও ভাল হয় না। অনেকেই কিষান-শ্রমিকদেবের চাইতেও খারাপ।

পান্না এবার বললো, অথচ দেখ আমাদের বড় সাহেবকে। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও .....

আরে দিদি, বড় সাহেব তো দেবতা আছে। ওর কথা বাদ দাও।

ঠিক বলেছ বড়ে ভাইয়া। আমি ওর নোকরানী কিন্তু আমাকে পর্যন্ত কি ইজ্জত দিয়ে কথা বলেন তা তোমাকে বলতে পারব না।

পান্না ঠিকই বলেছে। সেই সেবার জ্বর সেরে যাবার পর কলকাতা যাবার সময় পান্না একশ' টাকার নোটখানা না নেওয়ায় বড় সাহেব সত্যি বিস্মিত হয়েছিলেন। পরের বারই শঙ্কর গড় এসেই বড় সাহেব ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন. পান্না, তুমি কত মাইনে পাও ?

চল্লিশ টাকা বড়ে সাব।

বড় সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, সবাই আমার কাছে চায়—টাকা চায়। কেউ বেশী. কেউ কম। আমারও কিছু দিতে ইচ্ছা করে না।

পান্না চুপ করে মুখ নীচু করে শুনছে।

গতবার তোমাকে কিছু দিতে গেলেও যখন নিলে না, তখন ''

বড়ে সাব, অন্যায় হলে মাফ করবেন।

না, না, অন্যায় কিছু হয়নি, বরং তোমার মর্যাদাবোধ আমার খুব ভাল লেগেছে।

তখন বেশী কথা বলার সময় ছিল না। বড় সাহেব জামা কাপড় পরে তৈরী হতে না হতেই রায় সাহেব এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। দুপুরবেলায় দু'তিনজনকে নিয়ে খেতে এলেন কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর এক মিনিটও বসলেন না। সারা দিনের কাজকর্ম সেরে যখন ফিরলেন, তখন প্রায় আটটা বাজে।

বড় সাহেব ড্রইংরুমে বসতেই পান্না এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবৎ এগিয়ে দিল।

বড় সাহেব গেলাসটা ধরেই হাসতে হাসতে বললেন, আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরবৎ।

খানিকটা আগে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম।

আর কোন কথা না বলে উনি সরবৎ খেয়ে নিলেন। ওর হাত থেকে খালি গেলাসটা নিতে নিতেই পান্না এক ঝলক ওকে দেখেই বুঝল বড় সাহেব খুব খুশী হয়েছেন।

রাত্রে খেতে খেতে বড় সাহেব বললেন, আচ্ছা পান্না, গত বার কি আমার খুব জ্বর হয়েছিল ?

জী বড়ে সাব !

সারা রাতই তুমি জেগেছিলে, তাই না ?

ঠিক সারা রাত না। বোধহয় চারটে সারে চারটে পর্যন্ত।

বড় সাহেব হেসে ফেলেন, সারা রাত্রের আর বাকি থাকল কোথায় ?

পান্না চুপ করে থাকে।

বড় সাহেবও আর কোন কথা না বলে খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে চলে যান।

দু-এক মিনিট পরে এক গেলাস জল আর ওষুধ নিয়ে বড় সাহেবের শোবার ঘরে হাজির হয়ে বলে, এই দাবাই খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আজ আর কিতাব-টেতাব পড়বেন না।

কেন ?

সারা দিন তো একটুও আরাম করেন নি।

আমি কলকাতার ছেলে। এত সকাল সকাল ঘুমুতে পারি না।

হঠাৎ পান্না প্রশ্ন করে, আচ্ছা বড়ে সাব, কলকাত্তা খুব বড়া শহর ?

বড় সাহেব মুখ তুলে পান্নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কলকাতা যাবে ?

অমনভাবে সোজাসুজি বড় সাহেব কোনদিন ওর দিকে তাকান নি। পান্না লজ্জায় মুখ নীচু করে বললো, না, না, আমি কলকাতা যাবার কথা বলছি না।

তুমি তো কোন বড় শহর দেখনি, তাই না ?

ও মাথা নেড়ে জানাল, না।

ঠিক আছে, তোমাকে আমি বড় শহর দেখিয়ে দেব।

নেই বড়ে সাব, আমার মত নোকরানী বড়া শহরে গিয়ে কি করবে ?

কি আবার করবে ? এমনি বেড়িয়ে আসবে। আমিই এক বার সঙ্গে নিয়ে যাব।

ও-কথা বলবেন না বড়ে সাব।

কেন ?

আপনি দেবতা আছেন। আপনার সঙ্গে কি আমি যেতে পারি।

আমার শরীর খারাপ বলে তুমি সারা রাত জেগে আমাকে দেখাশুনো করতে পারলে, আর আমি তোমাকে···

ও-কথা বারবার বলবেন না বড়ে সাব। আমার শরম লাগে।

আচ্ছা তুমি খেয়ে এসো। তারপর কথা হবে।

আপনি আরাম করুন বড়ে সাব।

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বড় সাহেব বললেন, সারাদিন শুধু কাজ আর রাত্রে আরাম করে মন ভরে না। বরং একটু কথা বার্তা বললেই ভাল লাগবে। হঠাৎ বড় সাহেব একটু হাসলেন। বললেন, শুধু টাকাকড়ি ব্যবসাবাণিজ্যের কথা শুনে শুনে আর ভাল লাগে না।

পান্না মুখ নীচু করে শোনে।

জান পান্না, আমি বরাবর সাইকেল চড়ে স্কুল-কলেজ গেছি। আমাদের বাড়ী থেকে ইউনিভার্সিটি অনেক দূর বলে এম-এ পড়ার সময় ট্রামে যেতাম। সাইকেল চড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে কিন্তু চড়তে পারি না।

কেন ?

এখন তো আমি ছাত্র নই। এখন যে আমি অনেক টাকার মালিক, বড় সাহেব। এখন সাইকেল চড়লে কি কেউ আমাকে সম্মান করবে ? বড় সাহেব একটু মুচকি হেসে বললেন, এখন শুধু কর্তব্য আর কাজ করি, নিজের মন যা চায় তা করতে পারি না।

পান্না শুনছে। বড় সাহেবও একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন বলাই নন্দী বলে আমার এক বন্ধু আছে। আমরা দুজনে বরাবর একসঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়েছি। ও আমার সব চাইতে প্রিয় বন্ধু কিন্তু এখন লুকিয়ে-চুরিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।

কেন বড়ে সাব ?

বলাই সরকারী অফিসের টাইপিষ্ট আর আমি যে বড়লোক। তার বাড়ীতে গেলে তার সঙ্গে আড্ডা দিলে আমাদের পরিবারের সম্মান চলে যাবে যে।

সাচ বড়ে সাব ?

তবে কি আমি মিথ্যে বলছি ?

না, না, আমি তা বলছি না মাগার…

তাহলে একটা ঘটনা শোন। তখনও কলেজে পড়ি। আমি আমাদের একা গাড়ীতে বলাই-এর ভাই-বোনকে নিয়ে দুর্গা পূজার সময় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। আমাদের পরিচিত কেউ নিশ্চয়ই দেখেছিলেন আর তার ফলে আমাদের সমাজে কি রটে গেল জান ?

কি বড়ে সাব ?

রটে গেল আমি বাঙ্গালী মেয়েকে বিয়ে করেছি।

আচ্ছা !

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন, এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি একি কলকাতার বাড়ীতে পারতাম ? পারতাম না। অসম্ভব।

অনেক রাত হলো। এবার আপনি আরাম করুন বড়ে সাব।

আমার একটুও ঘুম পায় নি। তাছাড়া এসব কথা তো কাউকে বলতে পারি না। তাই বেশ লাগছে।

কিন্তু কাল সুবা নাস্তা করেই তো আবার সারাদিন কাজ করবেন। এখন আরাম না করলে ··

কাল সারাদিন যদি আরাম করি ?

অবিশ্বাস্য প্রশ্ন শুনে পান্না হাসে। পালটা প্রশ্ন করে, আপনি সারাদিন আরাম করবেন ?

আমি সারাদিন কোঠিতে থাকলে তোমার কোন অসুবিধে হবে ?

বড় সাহেবের কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে পান্নার মুখ। বলে, একি কথা বলছেন বড়ে সাব ?

আমি এমনি বলছি।

সত্যি কাল সারাদিন কোঠিতে থাকবেন ?

তুমি বল।

আপনার মর্জি বড়ে সাব।

আমি থাকলে তুমি খুশী হবে ?

মিষ্টি চাপা হাসি হেসে শুধু মাথা নেড়ে পান্না জানাল, হ্যাঁ।

যাও তুমি খেতে যাও।

আপনি দাবাই খেয়ে নিন।

তুমি খেয়ে এসে দিও।

আপনার নীদ আসছে না ?

না, আজ আমার চোখে ঘুম আসছে না। তোমার ঘুম পাচ্ছে ?

আবার পান্না মাথা নেড়ে জানাল না।

এক রাত্রির তীব্র বর্ষণেই শীর্ণ নদী পূর্ণ হয়। আগে বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু পরে চমকে উঠতে হয়। ঐ এক রাত্রির সেবা

যন্ত্রের পর আকাশ পাতালের দূরত্ব এভাবে কমে যাবে, পান্না আশা করে নি। ভাবতে পারে নি। কিন্তু যা ভাবা যায় না আশা করা যায় না, তাইতো জীবন। প্রকৃতির রূপ বদলের, চরিত্র বিবর্তনের নিয়ম আছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা. শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্ত আসা-যাওয়ার নিয়ম আছে কিন্তু মানুষ জীবনের ঋতু রঙ্গের কোন নিয়ম-কানুন নেই। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে যায়; বসন্তে নতুন করে পল্লবিত হয় কিন্তু পান্নার জীবনে বসন্তের শুরুতেই সব পাতা ঝরে গেল। সবুজের মুখোমুখি হয়েও সে শুধু চোখের জল আর রুক্ষতা নিয়েই পার্শেল একসপ্রেসে চড়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে মথুরার কাছে ফিরে এল। পান্না কি স্বপ্নেও এই দুর্দিনের কথা ভেবেছিল ?

না।

ভেবেছিল মধুমতীর মত ও নিজেও স্বামীর প্যার পাবে। ওর মুন্না হবে, মন্নী হবে। তারা হাসবে, খেলবে মারামারি করবে। পান্না ওদের বকুনি দেবে, আদর করবে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘুম পাড়াবে। এ স্বপ্ন দেখা কি অন্যায় ?

না। কিন্তু তবু সেই স্বাভাবিক, সাধারণ সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ও ভোগ-করতে পারল না। পারল না আরো অনেক কিছু।

চুপ করে বসে বসে পান্না ভাবে সেই ছোটবেলার শঙ্করগড় ওর প্রথম যৌবনের শঙ্করগড় কিভাবে বদলে গেল। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত বড় সাহেব যেন ম্যাজিক দেখালেন কিন্তু সেদিনের সেই চকচকে কারখানাও যে এভাবে কালো হবে, তা ও ভাবতে পারেনি।

শুধু কারখানা আর ঘরবাড়ীর বাইরের চেহারা নয়, মানুষ-গুলোর জীবনেও কত কি ঘটল। ষ্টোরবাবু সুকুমার দত্তর সংসার

জোড়া লেগেও আবার ভেঙ্গে গেল। রামপেয়ারীকে নিয়েই বর্মন বাবুর বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে শঙ্করগড়ের মানুষের অসন্তোষ জমতে জমতে একদিন ডিপোর মাঠের সভায় ফেটে পড়ল। শুধু ইউ-নিয়ন নয়, শঙ্করগড় ছেড়ে চলে গেলেন বর্মনবাবু।

বড় সাহেব আজকাল পান্নাকে অনেক কথাই বলেন। সেদিন কথায় কথায় বর্মনবাবুর কথা উঠল। বড় সাহেব বললেন, ছেলেটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। যে কাজ অন্য দশজনে পারবে না, সে কাজ ও অনায়াসে করতে পারে। আমি ওকে সত্যি ভালবাসি। ওকে অনেক সুযোগ সুবিধেও দিয়েছি কিন্তু যখন শুনলাম বউ-ছেলেমেয়েকে টাকা পাঠানও বন্ধ করে দিয়েছে ...

পান্না চমকে ওঠে, বর্মনবাবুর বিবি বাচ্চা আছে ?

বউ আছে তিন-চারটে বাচ্চা আছে বুড়ো বাবা-মা.....

সে কি ? আমরা তো শুনতাম উনি সাদীই করেন নি।

তাই বুঝি ও এখানে আজেবাজে মেয়েকে নিয়ে বাদরামী শুরু করেছিল ? বড় সাহেব একটু জোরে নিশ্বাস ফেলে একটু হেসে বললেন, দেখ পান্না অধিকাংশ মানুষই একটু স্ফুর্তির সুযোগ পেলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

ঠিক বলেছেন বড়েসাব। আপনার দয়ায় শঙ্করগড়ের মানুষ কিছু টাক-কড়ি পেয়ে কি আশ্চর্যভাবে বদলে গেল ভাবলেও অবাক লাগে।

শঙ্করগড়ের মানুষের দোষ নেই। সবাই বদলে যায়। আমার বাবাকে দেখেই আমি অবাক হয়ে যাই।

কথাটা শুনেই পান্না একটু অস্বস্তি বোধ করল। প্রসঙ্গ বদলা বার জন্য জিজ্ঞাসা করল, বড়ে সাব, খানা দেব ?

দাও।

খেতে খেতে বড় সাহেব বললেন, সবাই জানে কলকাতার গণ্ডগোলের জন্য আমি এখানে কারখানা করেছি কিন্তু তা নয়। কলকাতায় টুকটাক গণ্ডগোল চিরকালই ছিল, এখনও আছে। ওসব গণ্ডগোলে আমরা অভ্যস্ত। গণ্ডগোল কি এখানে নেই ?

জরুর আছে।

এইত অফিস থেকে আসার আগেই শুনলাম আমাদের ষ্টোর বাবু সুকুমার দত্ত শুকদেব বলে কোন এক লেবারারের বউকে নিয়ে···

পান্না আর ধৈর্য ধরতে পারে না। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বড়ে সাব ?

কি আর হবে ? ষ্টোরবাবুকে ছুরি মেরেছে।

জিন্দা আছেন ?

বদলোক সহজে মরে না।

বড সাহেবের কথায় পান্না হাসে।

হাসছ যে ? সত্যি বলছি খারাপ লোক চট করে মরে না। অনেক কাল অনেককে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তবে ওরা মরে।

বড় সাহেব চলে যাবার পর বুড়ো চৌকিদার জগন্নাথ ওকে অনেক কিছু বলেছিল। শুনেই ঘেন্নায় পান্নার সারা শরীরটা যেন বিষিয়ে উঠল।

বুড়ো চৌকিদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো দিদি, ফ্যাকটোরী চালু হবার দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন শঙ্করগড়ে এবার ইনকিলাব—ক্লান্তি এলে। ক্লান্তি এসেছে ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এসব উপরি পাওনাও আমাদের ভোগ করতে হবে তা তো কোনদিন ভাবিনি।

বড়ে ভাইয়া, সব সুখের মধ্যেও কিছু না কিছু দুঃখ থাকেই যেদিন মধুমতী সাদীর পর শশুরাল গেল, সেই আনন্দের দিনেও তো তোমার চোখের জল পড়ে ছিল, তাই না ?

বুড়ো জগন্নাথ একটু হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ দিদি, তা তো পড়েছিল।

পড়বেই। শুধু সুখ বা শুধু দুঃখ ভগবান দেন না।

জান দিদি, এবার হোলিতে নাকি নটঙ্গীর নাচ হবে।

এবার পান্না হাসে। বলে, বড়ে ভাইয়া, যাদেরই প্রকটু পয়সা আছে তারাই নটঙ্গীর নাচ দেখে।

কিন্তু তাই বলে আমাদের শঙ্করগড়ে ?

আগে পয়সা ছিল না বলে শঙ্করগড়ে নটঙ্গী আসে নি কিন্তু এখন কেন আসবে না ? তুমি সব কিছুতেই দুঃখ পেও না বড়ে ভাইয়া।

বুড়ো চৌকিদার আর তর্ক করে না। চুপ করে থাকে।

শঙ্করগড়ের মানুষের জীবনের গতি নাটকীয়ভাবে কখনও এগুচ্ছে, কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। মানুষের জীবনে যাই হোক না কেন, কারখানার নাটক একই ভাবে এগিয়ে চলেছে। মালগাড়ী বোঝাই করে লাইমষ্টোন, জিপসাম, কয়লা আর ক্লে আসছে, নামছে ডিপোর পাশে, শূন্য ওয়াগন ভর্তি হচ্ছে অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর হাজার হাজার বস্তা সিমেন্ট দিয়ে। স্কুলের আগে ছুটির পরে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা খানিকটা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সব মালগাড়ীর আসা-যাওয়া দেখে আর বিকেলবেলায় কলোনীর মাঠে রেলগাড়ী রেলগাড়ী খেলে। হীরার কোয়ার্টার থেকে ফেরার পথে পান্না ওদের দেখে আর মনে মনে হাসে। হঠাৎ হাসি হারিয়ে যায়

মন থেকে, গম্ভীর হয়, ভাবে। এরা যা দেখবে তাইতো শিখবে এরাই বড় হয়ে অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর কুলি-মজুর-মিস্ত্রী হবে। কেউ বা হয়ত অফিসের বাবু হবে। কিন্তু কেউ কেউ তো কিষাণ, শুকদেব, বর্মনবাবু, ষ্টোরবাবুও হবে? যদি কেউ রাম পেয়ারীর মত গিরিজার চায়ের দোকানে গিয়ে শিকার খুঁজতে যায়? যদি কেউ শুকদেবের বউয়ের মত কোন বাবুর সুখের সংসারে আগুন লাগায়?

ভাবতে গিয়েও ওর মাথাটা ঘুরে উঠল। হঠাৎ চোখে সব কিছু অন্ধকার দেখল। তারপর আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে আবার কারখানার ঐ লম্বা কালো চিমনিটা নজরে পলড়। ভাবল, এ সংসারে সবাই তো মধুমতীর মত সুখী হতে পারে না। কেউ ওর মত দাসী হবে, কেউ রামপেয়ারী হবে।

আচ্ছা বড়ে সাব। কলকাত্তা-বোম্বাই থেকে এখানে এসে আপনার খারাপ লাগে না?

বড় সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ একথার জিজ্ঞাসা কেন?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

না পান্না, এখানে এসেই বরং ভাল থাকি।

কেন বড়ে সাব? প্রশ্ন করেই পান্না ভীগণ লজ্জিত হলো।

আমাদের কলকাতার বাড়ীতে চব্বিশ ঘন্টাই শুধু ব্যববা-বাণিজ্য টাকাকড়ি আর লাভ-লোকসানের গল্প। সব সময় কি এইসব শুনতে ভাল লাগে? বিরক্ত লাগে, ঘেন্না লাগে।

ইচ্ছা করলেও পান্না চলে যেতে পারছে না। অত্যন্ত দ্বিধা সঙ্কোচের সঙ্গে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বড় সাহেবই আবার কথা বললেন, যখন আর সহ্য করতে

পারি না তখন বলাই-এর কাছে চলে যাই।

বলাইবাধু আপনাকে খুব ভালকাসে ?

ক্লাশ টু থেকে বি-কম পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। ভালবাসবে না ?

এত ভাল দোস্তকে আপনার কোম্পানীতে একটা ভাল নোকরি দিলেন না কেন বড়ে সাব ?

না পান্না, সে ক্ষমতা আমার নেই। বন্ধ-বান্ধবকে চাকরি দেওয়া পিতাজী পছন্দ করেন না। ওর ধারণা বন্ধু-বান্ধাবকে চাকরি দিলে কোম্পানীর কাজ ভালভাবে হবে না!

বড়ে সাব!

কি ?

একবার বলাইবাধুকে এখানে নিয়ে আসবেন ?

ওর অফিস থেকে ছুটি পাওয়া খুব মুস্কিল। তাইতো ওকে আনতে পারি না। তবে ওকে তোমার কথা বলেছি।

কি বলেছেন বড়ে সাব ?

বড় সাহেব একটু হাসলেন। একবার পান্নার দিকে চাইলেন তারপর বললেন, বলেছি তুমি খুব ভাল মেয়ে, তুমি আমাকে খুব যত্ন কর, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

কথাগুলো শুনেই পান্নার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে ওঠা-নামা শুরু করল যে হাঁপাতে হাপাতে বললো বড়ে সাব ওসব কথা বলবেন না। আপনি দেবতা আছেন আর আমি আপনার দাসী আছি।

পাথরের মূর্তির মত পান্না চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বড় সাহেবও মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বড় সাহেব ডাকলেন, পান্না!

জী!

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনেক অন্যায় অনেক খারাপ কাজ আমি করি, করতেই হয়। কলকারখানা চালিয়ে লাখ লাখ টাকা বাড়ীতে না দিলে আমাকে হয়ত বাবা-মা তাড়িয়ে দেবেন কিন্তু এমনি এমনি আমি মিথ্যে কথা বলি না।

গলতি মাফ করবেন বড়ে সাব। আমি তা বলিনি।

বড় সাহেব যেন ওর কথা শুনতেই পেলেন না। আপন মনেই বলে গেলেন, পান্না সত্যি তোমাকে আমার ভাল লাগে।

বড়ে সাব!

এই পৃথিবীতে বলাই আর তুমি ছাড়া কেউ নিস্বার্থভাবে ভালবাসে না। তাই শুধু স্বার্থের জন্যই.....

বড়ে সাব, অনেক রাত হয়েছে। খানা দেব?

বড় সাহেব আজ শুনতে চান না। শুনতে পারছেন না। আজ ওর বলার দিন। যেদিন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, যেদিন পৃথিবীর গহ্বর থেকে হাজার হাজার বছরের অব্যক্ত বেদনা চোখের জল আচমকা হঠাৎ বেরিয়ে আসে, সেদিন মাটির পৃথিবীর উপরের কিছু মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজ নেবার অবকাশ তার থাকে না।

পান্না!

জী বড়ে সাব।

একটু কাছে এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মত পান্না একটু এগিয়ে এল। বিছানায় শুয়ে বড় সাহেব একটা হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরলেন। একটু কাছে টানলেন।

পান্না।

জী বড়ে সাব।

একটু আমার কাছে বসবে ?

না, না, বড়ে সাব একথা বলবেন না।

অমি বর্মনবাবু না পান্না।

ছি ছি বড়ে, আমি তা বলি নি। আমাকে মাফ .....

আমি জানি তুমিও রামপেয়ারী না। তুমি আমার মত খারাপও না।

পান্না হঠাৎ একটু জোরেই বলে উঠল বড়ে সাব !

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন, বলেছি তো পান্না, আমি মিথ্যে কথা বলি না। বড়লোক কোটিপতিদের বাড়ীতে যে কত নোংরামী টাকার নীচে লুকিয়ে থাকে তা তুমি ভাবতে পারবে না। বর্মনবাবুর কথা, রামপেয়ারীর কথা সবাই জানতে পারে, কিন্তু আমি কলকাতায় না থাকলে যে আমার বউ আমার চাচার ছেলের ঘরে রাত কাটায় ..

বড়ে সাব ! এসব কথা আমাকে বলবেন না, আমি শুনতে পারি না।

পান্নার একটা হাত তখনও ওর হাতের মধ্যে। সেই হাত খানা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, পান্না, তুমি আমাকে দেবতা ভাবলেও আমি মানুষ। আমার টাকা আছে কিন্তু আর কিছু নেই। আমারও ইচ্ছা করে কেউ আমাকে ভালবাসুক আদর করুক। ইচ্ছা করে আমিও কাউকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি, আদর করি ভালবাসি।

পান্নার একফোটা চোখের জল হাতে পড়তেই বড় সাহেব চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে দু'হাত দিয়ে ওর দুটো হাত ধরে আরো কাছে টেনে নিলেন। পান্নার শাড়ীর

আঁচল দিয়েই ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, কাঁদছ কেন ? কেঁদো না। আমি বড়লোক কিন্তু বাংলাদেশে মানুষ হয়েছি বলে মানুষের চোখের জল দেখলে আমার চোখে জল আসে, কষ্ট হয়। বলাইয়ের মেজ মেয়েটা যখন মারা যায় তখন

বড় সাহেব আর বলতে পারলেন না। দুটো চোখ জলে ভরে গেল। গড়িয়ে পড়ল চিবুক বেয়ে।

পান্না সহ্য করতে পারল না। কাঁদতে কাদতেই নিজের আঁচল দিয়ে বড় সাহেবের চোখের জল মুছিয়ে দিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বড় সাহেবের দুটি চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। কাদতে কাদতেই বললেন, বলাই জীবনে শুধু একবার আমার কাছে টাকা চেয়ে ছিল। মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য নিজে সর্বস্ব খুইয়ে এসে আমার কাছে হাত পেতেছিল। আমার দু কেট ভর্তি টাকা নিয়ে হাসপাতালে পৌছেই দেখি হাসপাতালের সিঁড়ির উপর বসে বলাই আর ওর স্ত্রী পাগলের মত কাদছে।

পান্নার চোখেও জল। সে আর বড় সাহেবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারছে না।

কাঁদতে কাঁদতেই খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বড় সাহেব বললেন, পান্না আমাদের পাপের টাকায় কি কোন মানুষের কল্যান হতে পারে ? না, কখনই না। বলাইয়ের পকেটে একটা টাকাও ছিল না। তবু ঐ সোনার টুকরো মেয়েটার দাহ করার জন্য আমি ওকে একটা কানাকড়িও দিলাম না। দিতে পারলাম না পান্না, কিছুতেই পারলাম না।

বড় সাব!

আমি ধার করে টাকা এনে ওর সৎকার করলাম কিন্তু এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবার সময় আমার

পাপের টাকা দিয়ে ওর নিষ্কলঙ্ক দেহকে আমি কিছুতেই অপবিত্র করতে পারলাম না।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে পান্না আত্মবিস্মৃত হয়ে বড় সাহেবের পাশে বসে বসেই বলো কাদবেন না বড়ে সাব কাঁদবেন না।

বলাইয়ের তিনটে মেয়ের মধ্যে এই হতভাগী মেয়েটাই আমাকে সব চাইতে ভালবাসত। আমাকে কি বলে ডাকত জানি পান্না ?

কি ?

ছেলে। আমি ওকে কি বলে ডাকতাম জান ?

কি ?

নতুন মা। ওর কথা, ওর চেহারা মনে পড়লেই আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারি না।

পান্না দুহাত দিয়ে বড় সাহেবের মুখখানা তুলে ধরে বললো আর কাঁদবেন না বড় সাব। এবার একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।

শোব ?

হ্যা বড়ে সাব। দু'হাত দিয়ে পান্নার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন পান্না তুমি আমাকে একটু বুকের মধ্যে জড়িয়ে শোবে ?

ঘরের স্তিমিত আলোয় পান্না একবার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে বড় সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দুহাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন পান্না আজ কি পূর্ণিমা ?

জী বড়ে সাব।

তাই আজ এত আলো।

সমাপ্ত

B-135

ইনকিলাব

নিমাই ভট্টাচার্য

ছবি প্রকাশনী
মীরপুর, ঢাকা।